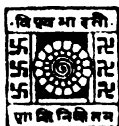
প্রাণতত্ত্ব

প্রাণতত্ত্ব

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ কার্তিক, ১৩৪৮
পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ, ১৩৫১

[illegible]

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

ভূমিকা

আমরা যে কত বড়ো জগতের মধ্যে বাস করছি, সেই বিপুল বিশ্বের মধ্যে আমাদের এই ঘরোয়া পৃথিবীর স্থান কতটুকু তা আমরা জেনেছি ইতিপূর্বে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার "পৃথ্বী-পরিচয়" প'ড়ে। আকারহীন বাষ্পপুঞ্জ গাঢ় হোতে হোতে কেমন ক'রে কঠিন হয়ে ধীরে ধীরে এই পৃথিবীতে পরিণত হোলো, তার পরিচয়ও পেয়েছি। পৃথিবীর উপরের স্তরটা যখন ঠাণ্ডা হয়ে ঘন হয়ে উঠল তখন জল ও স্থল মোটের উপর দু' ভাগে হোলো তা বিভক্ত ; জলই বেশি, ডাঙার ভাগ কম। ঠিক কোন্ সময়ে এবং কেমন ক'রে এই মরুভূমি শ্যামল তরুগুল্মে আচ্ছাদিত ও জীবজন্তুর প্রাণযাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠল, আর দিগন্তব্যাপী জলরাশি বিচিত্র জীবের বর্ণচ্ছটায় হোলো রমণীয়, তা ঠিক বলা যায় না ; তবে এইটুকু বলা যায় যে, হঠাৎ এক মুহূর্তে এই প্রাণলোকের সৃষ্টি হয়নি, জড় জগৎ যেমন যুগ-যুগ ধ'রে গড়ে উঠেছে, জীব-জগতের ইতিহাসও সেই রকম। গাছপালা জীবজন্তুর মধ্যে আমরা এখন যে বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি গোড়ায় তা ছিল না। অতি সহজ থেকে এর উৎপত্তি, বহু যুগ ধ'রে এর ক্রমবিকাশ এবং এখনো এই সৃষ্টির ক্রিয়া অব্যাহত।

এই বইতে পৃথিবীর ইতিহাসের মাত্র একটি দিক নিয়ে আলোচনা করব—সে হচ্ছে প্রাণতত্ত্ব।

প্রাণী আছে নানা রকমের। অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না এমন জীবাণু থেকে আরম্ভ ক'রে গাছগাছড়া, হাতিঘোড়া, মানুষ পর্যন্ত বিচিত্র তার আকার, বিভিন্ন তার প্রকৃতি। এদের সম্বন্ধে ভালো ক'রে জানবার জন্য নানা শাখা-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে—ব্যাকটিরিয়া সম্বন্ধে ব্যাকটিরিওলজি (Bacteriology), উদ্ভিদ সম্বন্ধে বটানি (Botany), জন্তুদের বিষয়ে (Zoology)। আমাদের জ্ঞান দিনে-দিনে এতই বাড়ছে যে, এতেও কুলোচ্ছে না। আরো অনেক খণ্ড খণ্ড ক'রে আলোচনা করতে হচ্ছে, যেমন দেহ সংগঠন সম্বন্ধে অ্যানাটমি (Anatomy), শারীরক্রিয়া সম্বন্ধে ফিজিওলজি (Physiology), ভ্রূণতত্ত্ব আলোচনার জন্য এম্ব্রায়োলজি (Embryology), পোকামাকড়দের বিষয় নিয়ে এণ্টোমলজি (Entomology), পাখিদের কথা নিয়ে অরনিথোলজি (Ornithology) ; তার পর জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এভল্যুশন (Evolution), তাদের বংশানুক্রম জানবার জন্য হেরিডিটি (Heredity) ইত্যাদি। আর বেশি নাম করব না, এর থেকেই বোঝা যাবে, কেবল প্রাণীদের সম্বন্ধেই আমাদের কত জানবার আছে—এতই বিস্তার লাভ করেছে আমাদের জ্ঞান। কিন্তু এই রকম খণ্ড-খণ্ড ভাবে আলোচনা করবার আগে জীবজগৎ সম্বন্ধে সমগ্রভাবে চিন্তা ক'রে দেখলে ক্ষতি নেই, পরে এক-একটি বিষয়ে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা যেতে পারে।

প্রাণজগতকে সমগ্রভাবে দেখে যে-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে তাকেই আমরা প্রাণতত্ত্ব বলছি। প্রাণতত্ত্ব নিয়ে যখন আলোচনা করি তখন কত রকমের প্রাণী আছে, তাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য কী, তা আলোচনা করি না, তা করেন বটানিস্ট (Botanist),

জ্যুলজিস্ট (Zoologist) বা অ্যানথ্রোপলজিস্ট (Anthropologist)—প্রাণীবিৎ জানতে চান প্রাণীদের উৎপত্তি কী ক'রে হোলো, তাদের বংশের ধারা চলছে কী উপায়ে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো যোগ আছে কি না। তাঁকে প্রথমেই যার উত্তর খুঁজতে হয় সে বড়ো কঠিন প্রশ্ন,—প্রাণ বলতে কী বোঝায়। এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব কোনো প্রাণীবিৎ এখনো দিতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না, তবে এই কঠিন সমস্যার আলোচনায় অবতীর্ণ হবার পূর্বে জীবের প্রকৃতি কী, তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত মিল কী আছে, প্রভেদই বা কোথায়, এই সব বিষয়ের আলোচনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

আমাদের চারিদিকে যে জীবলোক, সেখানে আমরা সাধারণত কী দেখতে পাই। দেখি যে, জীবমাত্রেই সচল ও সচেতন না হোলেও প্রত্যেকেই ক্রিয়াশীল, জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এক মুহূর্ত্ত তাদের স্থিতি নেই। অবিশ্রাম চলছে তাদের দৈহিক পরিবর্ত্তন, প্রতিক্ষণে তারা বেড়ে চলেছে একটা নির্দিষ্ট সীমায় না পৌঁছা পর্যন্ত। বাড়বার জন্য সর্বদা খোরাকের দরকার—খোরাক সংগ্রহের ঐকান্তিক চেষ্টায় আপনার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সর্বদা চলে যোঝাযুঝি; বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে প্রজননের আকাঙ্ক্ষা হয় প্রবল এবং এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থাকে অমরত্বের প্রয়াস। জগতের রঙ্গমঞ্চে এই যে প্রকাণ্ড একটি নাটকের অভিনয় অবিশ্রাম চলেছে, দর্শক হিসাবে তা দেখবার কিছু চেষ্টা করা গেছে এই বইতে।

শান্তিনিকেতন
১৫ই কার্তিক, ১৩৪৮

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র

প্রাণতত্ত্ব

প্রাণের লক্ষণ

বিচিত্র এই জীবজগৎ। যে-জীবাণু মানুষের রক্তে আশ্রয় নিয়ে ম্যালেরিয়া সৃষ্টি করে, তা এত ছোটো যে অনায়াসে একটি-মাত্র রক্তকণিকার (blood corpuscle) মধ্যে ঢুকে সে বাসা বাঁধতে পারে। এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে আন্দাজ ৫০ লক্ষ লাল রক্তকণিকা পাওয়া যায়—তাহলেই বোঝা যাবে এক-একটি রক্ত-কণিকা কত ছোটো। ম্যালেরিয়ার জীবাণু নিশ্চয় আরো ছোটো তা না হোলে রক্তকণিকার মধ্যে ঢুকে থাকে কী ক'রে। এর চেয়ে আরো ছোটো জীবাণু আছে বিস্তর। এই তো গেল ছোটোর কথা। পৃথিবীতে অতি বৃহৎ জন্তুর যুগ অবশ্য চলে গেছে—সেই যুগের ডাইনোসর (Dinosaur) বা ম্যামথ-এর (Mammoth) কথা ছেড়ে দিলেও বর্তমানে সমুদ্রে যে তিমি পাওয়া যায় তার এক-একটা লম্বায় ৯৫ ফিটেরও বেশি। এই রকম একটি তিমির ওজন প্রায় ১৫০ টন, অর্থাৎ ৪০০০ মনেরও অধিক। সমুদ্রের জলের নিচে কত রকম অদ্ভুত জীবজন্তু বাস করে, যারা দেখেছে তারাই তা বলতে পারে। ডাঙার জীবজন্তুর মধ্যেও রকমারি কম নয়। একবার কোনো বটানিক্যাল গার্ডেন ও চিড়িয়াখানা ঘুরে এলে জীবনলীলার বৈচিত্র্য দেখে আমাদের মন

কৌতূহলে ভ'রে ওঠে। কোনো বিজ্ঞানী গণনা করে দেখেছেন যে পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির জীব আছে আড়াই লক্ষ।



১. প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্তু ডাইনোসর

আমরা এদের সকলকেই জীব বলি কেন। জড়পদার্থের সঙ্গে এদের কী পার্থক্য। অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন ক্ষুদ্রতম জন্তু যে অ্যামিবা (Amœba), আর জটিল শারীরিক যন্ত্রসম্পন্ন যে মানুষ এই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনো যোগ যে থাকতে পারে, সহজে তা মনে হয় না। নটে শাক আর তালগাছ, পুকুরের পুঁটিমাছ আর সমুদ্রের তিমি, মশা আর হাতি, ইঁদুর আর মানুষ, এরা সবাই জীব, সকলেরই প্রাণ আছে। ইট, পাথর বা একটুকরা লোহার সঙ্গে এদের তফাত কোথায়। এদের প্রাণ আছে অন্যদের প্রাণ নেই বললে কিছু বলা হোলো না, প্রাণের লক্ষণগুলি কী। প্রথমেই

বলতে ইচ্ছে করে ইটপাথর জড়পদার্থ, অর্থাৎ চলতশক্তিহীন; আর প্রাণীরা নড়েচড়ে বেড়াতে পারে; কিন্তু তালগাছ কি চলাফেরা করতে পারে। তাহলে তো ঠিক জবাব দেওয়া হোলো না, আরো ভালো ক'রে ভেবে দেখতে হবে।

তলিয়ে দেখলে দেখব প্রাণীমাত্রেরই তিনটি বিশেষ লক্ষণ আছে:

(১) আঘাত পেলে তারা সাড়া দেয়।

(২) তারা বাইরের থেকে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে সেই খাদ্য পরিপাক ক'রে শরীরের নিত্য পরিবর্তন ঘটাতে থাকে।

(৩) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারা বাড়তে থাকে এবং বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ভাগ ক'রে আরো নতুন প্রাণী সৃষ্টি করে।

অভিঘাতের প্রত্যুত্তর

চিমটি কাটলে চেঁচিয়ে উঠি, আগুনের ছেঁকা লাগলে হাত টেনে নিই, ঠাণ্ডা লাগলে হাঁচতে থাকি, আফিম খেলে ঝিমোই— এ সবই বাইরে থেকে নানারকম অভিঘাতের রকমারি সাড়া বা প্রত্যুত্তর। শরীরের সাড়া দেবার এই প্রণালীর সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাশক্তির যোগ নেই। সহজেই তার প্রমাণ পাই; চেয়ারে ব'সে পা ঝোলানো অবস্থায় কেউ যদি হাঁটুর ঠিক নিচে একটা ঘা মারে তবে ইচ্ছে করি বা না করি আমার পা লাথি মারবার

মতো ভঙ্গীতে সামনের দিকে লাফিয়ে উঠবে। যতবার এই-রকম আঘাত করা যাবে ততবারই লাফাতে থাকবে।

আঘাত সব সময় প্রত্যক্ষ না হোতে পারে। চারদিক থেকে আমরা কত রকম অভিঘাত অগোচরে পাই তা খেয়াল করিনে, অনেক বিষয় আমাদের সহজে জানবার উপায়ও নেই। আলো-অন্ধকার, ঠাণ্ডা-গরম, জল-হাওয়া, আবহাওয়ার বা ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের দেহের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তা কতকটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু যে-জমিতে বাস করি, সেটা জলা না শুকনো, সমুদ্র থেকে তার উচ্চতা কতটা, তার মাটির গুণাগুণ কী এই সব পারিপার্শ্বিক অভিঘাতে আমাদের শরীর কী রকম সূক্ষ্মভাবে প্রত্যুত্তর দিচ্ছে, তা কি আমরা প্রত্যহ অনুভব করি।

মানুষের কথা এতক্ষণ বললুম কিন্তু এমন প্রাণী নেই যে বাইরের অভিঘাতে কোনো না কোনো সাড়া না দেয়। অ্যামিবার একটি সেলের (cell) কোনোখানে যদি পিন দিয়ে সামান্য খোঁচা দেওয়া যায় তো সে তার দেহ তখুনি সংকুচিত ক'রে ফেলে। লজ্জাবতীলতার যে-কোনো জায়গায় জ্বালানো দেশলাইয়ের কাঠি মুহূর্তের জন্য যদি ধরা যায় তবে একটু পরেই পাতাগুলি মুড়তে আরম্ভ করে এবং ক্রমশ পাতার ডালগুলি নুয়ে পড়ে। ব্যাঙের পায়ের একটি পেশী (muscle) কেটে বের করে দুদিকে টেনে বেঁধে রেখে যদি এক প্রান্তে বৈদ্যুত প্রবাহ ছুঁইয়ে দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সেটা অন্যদিকে সিঁটকে টেনে নেয়।

চোখে দেখতে না পেলে যে সাড়া দিল না সে ভুল করলে চলবে না। লজ্জাবতীলতার উদাহরণ দিলুম কারণ তা সকলেরই পরিচিত এবং তার সাড়া দেওয়া পরখ করা সহজ ব'লে; কিন্তু প্রত্যেক গাছই উত্তেজনা পেলে সাড়া দিয়ে থাকে। লজ্জাবতীর মতো তাদের সকলের পাতা নাড়বার কলকবজা নেই, তাই তাদের সাড়া দেওয়া আমরা চোখে দেখতে পাই না, সাড়া যে দেয় তা জানতে গেলে আমাদের অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে হবে। সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে।

অপঘটন (Katabolism) ও উদ্‌ঘটন (Anabolism)

আমরা খাই বল পাবার জন্য; চ'লে ফিরে, হেসে কেঁদে, কথা কয়ে, বই প'ড়ে প্রতি মুহূর্তে সেই বল ক্ষয় করতে থাকি। সঞ্চিত শক্তি সম্পূর্ণ ক্ষয় হবার আগেই আবার আহারের চেষ্টা দেখতে হয়। একদিকে শক্তি সঞ্চয় অন্য দিকে সেই শক্তি ক্ষয় করা, এ'কেই এক হিসাবে জীবনধারণ বলা যেতে পারে। উপার্জন করি ব্যয় করার জন্য, ব্যয় করি ব'লেই আবার উপার্জন করতে হয়।

শক্তি আমাদের কাছে নানান মূর্তি নিয়ে প্রকাশ পায়। সূর্য থেকে আলো আর উত্তাপ এই দুই শক্তি পৃথিবীতে এসে পড়েছে। আকাশে বৈদ্যুতশক্তি রয়েছে, বাজ পড়লে আমরা তার প্রকোপ

অনুভব করি। উপযুক্ত প্রণালী আবিষ্কার করতে পারলে বিজলি-বাতি জ্বালানো, ট্রাম-রেলগাড়ি চালানো এমন কি পৃথিবীতে যত কিছু কলকবজা আছে সবই চালাবার মতো যথেচ্ছ পরিমাণ বৈদ্যুতশক্তি আমরা আকাশ থেকেই আহরণ করতে পারি।

আলো উত্তাপ বিদ্যুৎ ছাড়াও শক্তির পরিচয় দেখি চুম্বকের আকর্ষণ করার ক্ষমতায়, মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্যে, পৃথিবীর মহাকর্ষণশক্তিতে। এ সবই হোলো প্রকাশের বিভিন্ন রূপ, একই শক্তি নানারূপে আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছে। সেইজন্য, আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যদি এক শক্তিকে অন্য শক্তিতে পরিবর্তন হোতে দেখি। সর্বদাই তা ঘটছে এবং আমরা ইচ্ছা করলেই সেই রকম পরিবর্তন ঘটাতেও পারি। কয়লার আগুন দিয়ে জল গরম করছি এঞ্জিন চালাবার জন্য, উত্তাপশক্তি তাতে চলৎশক্তিতে পরিণত হচ্ছে। বিদ্যুৎ দিয়ে আলো জ্বালাই। পেট্রোল পুড়িয়ে মোটরগাড়ি চালাই। এক শক্তিকে যেমন অন্য শক্তিতে পরিবর্তন করা যায় তেমনি তাকে সঞ্চয় ক'রে লুকিয়ে রাখাও চলে—লোহার সিন্দুকে টাকা পুরে রাখার মতো। সামান্য একটু বারুদের মধ্যে কত শক্তি লুকানো আছে তার প্রমাণ পাই যখন দেখি বন্দুকের গুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে দু-চার মাইল অতিক্রম করে চলে যায়।

প্রত্যেক যৌগিক পদার্থের মধ্যে এই রকম চাপা শক্তি লুকানো আছে। কোনো কারণে যখন তাদের যৌগিক অবস্থা ভাঙা যায় তখনই পাওয়া যায় তাদের শক্তির পরিচয়। একটা

উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। আঙুর প্রভৃতি ফলের রসে গ্লুকোজ (glucose) ব'লে যে চিনি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তার রাসায়নিক গঠন হচ্ছে $C_6 H_{12} O_6$ [১]। এই চিনির একটি অণুর (molecule) মধ্যে ৬ ভাগ কার্বন, ১২ ভাগ হাইড্রোজেন ও ৬ ভাগ অক্সিজেন আছে। আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে হাওয়া থেকে অক্সিজেন ফুসফুসের মধ্যে নিচ্ছি, সেই অক্সিজেন রক্তের ভিতরে যাচ্ছে। অক্সিজেনের গুণ এই যে, সে যে-কোনো পদার্থের সংস্পর্শে আসে তার সঙ্গে মেলবার চেষ্টা করে। গ্লুকোজ খেলে পেটের ভিতর রক্তের অক্সিজেন ঐ চিনির ৬ ভাগ কার্বনকে ছিনিয়ে নিয়ে কার্বন-অক্সিজেন মিশ্রিত কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস তৈরি করে। বাকী থাকে দু-ভাগ হাইড্রোজেন (H_2) ও একভাগ অক্সিজেন (O), তার থেকে কয়েকটি জলের অণু (H_2O) প্রস্তুত হয়। চিনির প্রত্যেক অণুকে এইভাবে ভাঙা ও গড়ার মধ্যে অনেকখানি শক্তির উদ্ভব হয় নিশ্চয়ই। চিনি খেয়ে সেই শক্তি আমরা ব্যবহার করি আমাদের শরীর গরম রাখবার জন্য বা অন্য কাজে।

১ কাজের সুবিধার জন্য সংকেত ব্যবহার করা বিজ্ঞানে খুব প্রচলিত। অঙ্গারগ্যাস বা কার্বন-ডাই-অকসাইড গ্যাস এতবড়ো কথা সর্বদা ব্যবহার না করে CO_2 বলা বা লেখা কি সুবিধাজনক নয়। রাসায়নিক দ্রব্যের সাংকেতিক চিহ্নের আর-একটি মস্ত সুবিধা—দেখলেই বোঝা যায় তার ভিতর কী কী মৌলিক পদার্থ কত পরিমাণে আছে। যেমন CO_2 দেখলেই জানতে পারি অঙ্গারগ্যাসের প্রত্যেক অণুতে একটি কার্বন C ও দুটি অক্সিজেন O_2 পরমাণু আছে।

আমরা যেসব জিনিস খাই তার প্রত্যেকটায় কতখানি উত্তাপশক্তি লুকানো আছে তা পরিমাপ করা শক্ত নয়। সেই বস্তুগুলি খেলে শরীরে যে উত্তাপ জন্মায় তাও মাপ করা যায়। সূক্ষ্মভাবে মেপে দেখা গেছে এই দুইয়ের মধ্যে নিখুঁত সামঞ্জস্য আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে জন্তুরা কোনো অবাস্তব উপায়ে শক্তি সংগ্রহ করে না, তারা নড়াচড়া চলাফেরা দৌড়াদৌড়ি যা-কিছু শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করে তার উপযোগী শক্তি কতকগুলি খাদ্যবস্তু থেকে সংগ্রহ করে।

গাছপালা খাবার জন্য নড়েচড়ে বেড়াতে পারে না, তাই তাদের অন্যরকম উপায় অবলম্বন করতে হয়। তাদের যা-কিছু খাদ্য তারা মাটি থেকে নেয়। মাটি থেকে যেসব আহার্য পায় তা জন্তুদের খাদ্যের মতো তৈরী জৈব পদার্থ (protein, carbohydrate বা fat) নয় যাকে অক্সিজেন দিয়ে ভাঙলেই রাসায়নিক শক্তির উদ্ভব হোতে পারে। উদ্ভিদের পদ্ধতি এই : মাটিতে যেসব ধাতব পদার্থ আছে, জলের সঙ্গে গুলে তা উপরের দিকে পাতার তারা ভিতর টেনে তোলে। সেখানে পাতার চার পাশের হাওয়াতে যে অঙ্গারপদার্থ (কার্বন) আছে সূর্য-রশ্মির সাহায্যে তার সঙ্গে মিশিয়ে কার্বোহাইড্রেটের ন্যায় জটিল জৈব পদার্থ তৈরি ক'রে জমিয়ে রাখে। শক্তিব্যয়ের প্রয়োজনের সময় এই জটিল বস্তুগুলিকে আবার অক্সিজেন দিয়ে ভেঙে ফেলে। এই রকম ভাঙা ও গড়া ক্রমাগত চলে। তাকেই আমরা অপঘটন ও উদ্‌ঘটন বলেছি।

জন্তুরা প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট্ প্রভৃতি কতকগুলি জটিল জৈব পদার্থ নিয়েই পুষ্টির কাজ শুরু করে আর উদ্ভিদ সহজ খনিজ পদার্থ নিয়ে তাকে গোড়ায় জৈব পদার্থে পরিণত করে, তারপরে করে ভাঙাচোরা। মোটের উপর জীবমাত্রেরই শরীরের মধ্যে অবিরাম ভাঙা ও গড়া (অপঘটন ও উদ্‌ঘটন) চলতে থাকে, যখন গড়ার ভাগ বেশি চলে তখন সে বাড়তে থাকে, ভাঙার ভাগ বেশি হোলে তখন হয় তার ক্ষয়।

জীবের এই যে অপঘটন এবং উদ্‌ঘটনের ক্ষমতা, জড়ের মধ্যে তা দেখা যায় না। তর্ক তোলা যেতে পারে যে মিছরির দানা তো জীবেরই মতো বাইরে থেকে খোরাক সংগ্রহ ক'রে নিজের আয়তন বাড়াতে পারে। সত্যই স্ফটিক (crystal) জাতীয় দ্রব্যের বাড়বার এই ক্ষমতা জীবধর্মের এত কাছাকাছি আসে যে প্রাণতত্ত্ববিদেরা এক-এক সময়ে মনে করেছেন, জীবনপ্রণালীই হয়তো স্ফটিকীকরণের—ক্রিস্টেলিজেশনের (crystallisation) একটা রূপান্তর। কিন্তু মিছরির দানা বাড়ে ক্রমাগত বাইরের যোগে, জীবকোষ বাড়ে ভিতর থেকে।

বৃদ্ধি (Growth), বিভাজন (Multiplication) ও প্রজনন (Reproduction)

খাদ্য থেকে জীব যে কেবল শক্তি সঞ্চয় করে তা নয়, তার বাড়বার উপাদানও সংগ্রহ করে। বৃদ্ধির মূল কথা হচ্ছে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হওয়া। কেবল জীবনরক্ষার জন্য যেটুকু খেলেই

চলে বাড়বার জন্য আমাদের তার চেয়ে বেশি খেতে হয়। প্রাণীমাত্রেরই উৎপত্তি একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র জীবকোষ (cell) থেকে। সেই একটি সেল থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এই রকম বাড়তে বাড়তে লক্ষ লক্ষ জীবকোষের সমষ্টিতে আমাদের দেহ গড়ে উঠেছে। মানুষের বেলায় একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির আয়তন তার আদিম বীজকোষের তুলনায় ১৫,০০০,০০০ গুণ বড়ো। সেই একটি জীবকোষকে বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে তাহলে কতখানি বহুগুণিত হোতে হয়েছে। জীবকোষের নিজেকে দ্রুত ভাগ করবার ক্ষমতা লক্ষ্য করলে আশ্চর্য হোতে হয়। প্যারামেসিয়াম (Paramecium) নামে প্রোটোজোয়া (Protozoa) জাতীয় জীবাণুর সেল এক ইঞ্চির এক শত ভাগের বেশি লম্বা নয়। তার একটিমাত্র জীবাণু নিয়ে এক বাটি জলের মধ্যে যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে সাত দিন পরে গুণতি করলে দেখা যাবে সেই একটি থেকে ১০লক্ষ জীবাণু জন্মেছে। চোখে দেখা যায় না এমন জীবাণুদের কথা ছেড়ে দিলেও অনেক জাতের পোকামাকড় আছে যারা খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। দেয়ালি পোকার কথা আমরা সকলেই জানি। দেয়ালি পোকার একটিমাত্র জননীর যত সন্তানসন্ততি হয় তারা যদি সকলেই বেঁচে থাকত এবং বংশবৃদ্ধি করতে পারত তবে দু-তিন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষের ৩০ কোটি লোককে চাপা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা তাদের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব হোত না।

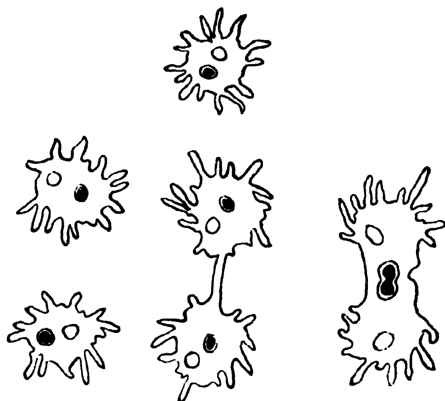
সেল বাড়ে নিজেকে ভাগ ক'রে ক'রে। বেলুনের মতো

ফুলে' উঠে' ক্রমাগত তার নিজের আয়তন বাড়িয়ে যায় না, খেয়ে পুরোপুরি পুষ্টিলাভ করলেই সে নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। খণ্ডগুলি আবার নিজেদের ভাগ করতে থাকে, এই রকমে খুব দ্রুত তাদের বৃদ্ধি চলে। তা যদি না হোত তাহলে আমরা সকলেই এক-একটা মস্ত ফুটবলের মতো হতুম, হাত-পা নাক-কান কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গই বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারত না।

জীবনের ধর্ম বাড়া, কিন্তু তাই যদি একমাত্র সত্য হোত তাহলে কী ব্যাপার দাঁড়াত, সেটাও একটা ভাববার বিষয়। আমরা সব তালগাছ ছাড়িয়েও উঁচু হয়ে উঠতুম, আমাদের নাক বলত হাতির শুঁড়ের চেয়ে লম্বা হব, হাত বলত কৈলাস পাহাড় থেকে পাথর কুড়িয়ে আনব, কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবীতে আর স্থান সংকুলান হোত না। তাই বাড়ার সঙ্গে আছে থামা। জীবনপ্রণালীতে বাড়া এবং ঠিক সময়ে থামা, দুইই প্রয়োজন।

খুব নিচের স্তরের জীবজন্তু নিজেকে দু-ভাগ ক'রে প্রজনন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এ-স্থলে বৃদ্ধির সঙ্গে প্রজননের বিশেষ তফাত নেই। অ্যামিবার একটা সেল পূর্ণবয়স্ক হোলেই নিজেকে দু-ভাগ করে। বাচ্ছা-সেলটি তখন আবার বড়ো হোতে থাকে, সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট হোলেই ভাগ হয়ে চারটে হয়ে যায়। এদের কোনো অবয়ব নেই, এরা যে-সে রকমে ভাগ হোতে পারে, কিন্তু উচ্চস্তরের জীবের পক্ষে এত সহজ উপায়ে বংশরক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই প্রজননের কাজে এদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। শরীরের মধ্যে দুটিমাত্র সেল ভার

নিয়েছে প্রজনন-ক্রিয়ার। পুরুষের শরীরের একটি জননকোষ (germ cell) স্ত্রীর শরীরের অন্তঃস্থিত ডিম্বকোষের (egg-



২. অ্যামিবার বিভাজন

নিম্নস্তর জীবের অ-যৌন জনন-প্রণালী

cell) সঙ্গে যেই মিলিত হয় অমনি সেই ডিম্বকোষটি বাড়তে থাকে এবং ভাগ হোতে থাকে অ্যামিবার সেলেরই মতো। এই রকমে সৃষ্টি হয় নূতন প্রাণী।

প্রজননের ইচ্ছা জীবমাত্রেই অন্তর্নিহিত। এই উপায়ে বংশ-বৃদ্ধি করার চেষ্টার মূলে রয়েছে মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়া, নিজেকে অমর করা। বাড়বার ক্ষমতা হোলো গোড়াকার কথা। কিন্তু বাড়ার সীমা নির্দিষ্ট থাকাতে এক জায়গায় এসে সব থেমে যায়,

জীবন তা মানতে চায় না, সে যে অসীমের পিয়াসী, মৃত্যুকে সে অতিক্রম করবেই। নিজেকে আর বাড়াতে না পেরে সে যেন তখন সন্তানসন্ততির মধ্য দিয়ে নিজেকেই নতুন করে সৃষ্টি করে। উচ্চস্তরের জীবের মধ্যে এই সৃষ্টিকার্য একাকী হয় না, দুজন না হোলে বংশরক্ষা হয় না। স্ত্রীকে পুরুষের সাহায্য নিতে হয়, পুরুষকে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হোতে হয়। প্রকৃতি পুরুষের লীলা এইখানেই—তার বিরোধে, তার মিলনে।

জীবকোষ

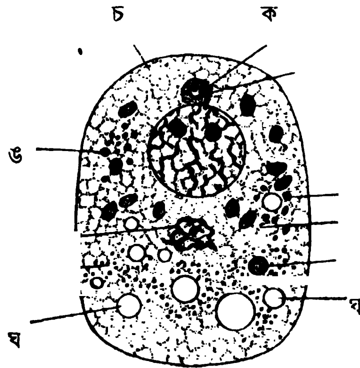
জীবকোষের দেহ

অধিকাংশ জীবকোষ খুব ছোটো, এত ছোটো যে খালি-চোখে নজরে পড়ে না। এইজন্য অণুবীক্ষণ আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত জীবের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ ছিল।

১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে Hooke নামে একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদের একটুখানি অংশ অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দেখলেন অসংখ্য চৌকো চৌকো বাক্স পাশাপাশি ইটের মতো সাজানো। তাঁর ধারণা জন্মাল সব জীবকোষই চৌকো বাক্স বা ঘরের মতো— তাই তার নাম দিলেন "সেল"। সেল কথাটার আসল মানে হচ্ছে দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোটো কুঠরি। উদ্ভিদ পরীক্ষা না ক'রে তিনি যদি কোনো জন্তুর দেহাংশ দেখতেন তাহলে তার ভিতর এই রকম বাক্স-চেহারা সেল তাঁর নজরে পড়ত না, কেননা জন্তুদের অধিকাংশ জীবকোষের দেয়ালের মতো খোলস নেই, তাদের আকৃতিও সব সময়ে চৌকো নয়। সে যাই হোক, মোট কথা অণুবীক্ষণ না হোলে জীববিজ্ঞান বেশি দূর অগ্রসর হোত না। এই যন্ত্রটির যত উন্নতি হচ্ছে এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানও তত প্রসার লাভ করছে। ভালো অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে যে-কোনো জিনিস হাজার গুণেরও বেশি

বড়ো ক'রে দেখতে পাওয়া যায়। খুব অল্প জিনিসই আছে যা এখন আমাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে। অণুবীক্ষণ দিয়ে কেবল যে সেলের উপরিতলের চেহারা দেখতে পাই তা নয়, তার ভিতরে যেসব অতি সূক্ষ্ম অবয়ব রয়েছে তাদের বিষয়েও সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারি।

এর থেকে মনে করা ঠিক নয় যে সেল মাত্রই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়; সে এমন একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু যা বিজ্ঞানীরাই কেবল যন্ত্র সাহায্যে দেখতে পান। সদ্যোজাত পাখির ডিম যাতে ভাবী প্রাণের সঞ্চার হয়নি, একটি অখণ্ড জীবকোষ।



৩. জন্তুদের সেলের বহুগুণিত নমুনা।

ক. সেনট্রোসোম খ. কোষকেন্দ্রিকা
গ. সাইটোপ্লাজম ঘ. হাওয়া-ভরা বুদ্‌বুদ
ঙ. কোষকেন্দ্র চ. পাতলা আবরণ

সেল মাত্রেরই প্রধান বস্তু হচ্ছে খানিকটা হড়হড়ে জেলির মতো জিনিস যার নাম প্রোটোপ্ল্যাজম (protoplasm)। অণুবীক্ষণ দিয়ে প্রোটোপ্ল্যাজম ভালো করে দেখলে তার ভিতর দেখতে পাব :

(১) খানিকটা স্বচ্ছ জলীয় অংশ যার নাম সাইটোপ্ল্যাজম (cytoplasm)।

(২) তার মধ্যস্থিত বিন্দু-আকার কোষকেন্দ্র (nucleus)।

(৩) তারই পাশে আরো ক্ষুদ্র তারার মতো দেখতে একটি বিন্দু—সেন্‌ট্রোসোম (centrosome)। সাধারণত উদ্ভিজ্জ সেলে সেন্‌ট্রোসোম দেখতে পাওয়া যায় না।

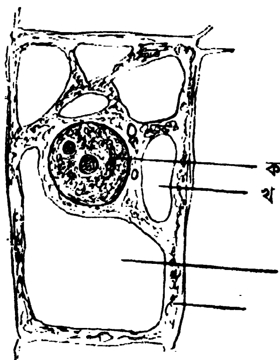
(৪) কোষকেন্দ্রের মধ্যে ধুলোর কণার মতো কখনো বা পাকানো দড়ির মতো কতকগুলি ক্ষুদ্রকায় বস্তু যার নাম ক্রোমোসোম (chromosome)।

(৫) এই সব পদার্থ আবদ্ধ করে রাখে যে খোলস— (cell wall)। গাছগাছড়ার সেলেই কেবল শক্ত পুরু খোলস দেখা যায়।

উল্লিখিত সেলের বস্তুসমষ্টির মধ্যে কোষকেন্দ্র হচ্ছে সবচেয়ে প্রধান বস্তু। সাধারণত এর আকৃতি গোল বা ডিমের মতো। খুব ভালো করে দেখলে কোষকেন্দ্রের মধ্যেও আবার খুব ছোটো ছোটো সরষে-দানার মতো দুটি নিউক্লিওলাই (nucleoli) দেখতে পাওয়া যায়। এই দুটি একমুহূর্তও স্থির থাকে না, শুধু তাই নয় এদের আকৃতিরও সর্বদা পরিবর্তন হয়।

সেল সাধারণত এত ছোটো যে এদের প্রায় ২৫০০টা পর-পর এক লাইনে সাজালে এক ইঞ্চি মাত্র জায়গা জোড়ে। কিন্তু এইটুকু পরিধির মধ্যে তারা এক-একটি পরিপূর্ণ জগৎ। ছোটো পৃথক ও স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করার পূর্ণমাত্রায়

ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু যখন তারা অনেকে একত্রে মিলে একটি প্রাণী গড়ে তোলে তখন সৈন্যদলের মতো তারা দলবদ্ধভাবে সুনিপুণ শৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে পারে। আমাদের শরীরের সঙ্গে ইটের তৈরী বাড়ির উপমা সহজেই মনে আসে, কিন্তু উপমাটা ঠিক খাটে না। কেননা বাড়ির ইটগুলি জড় বস্তু, একটা ইটের সঙ্গে আর-একটার কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু যে-বস্তু দিয়ে মানুষের শরীর গড়া তার প্রত্যেকটিই জীবন্ত এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত।



৪. উদ্ভিদের সেলের বহুগুণিত নমুনা

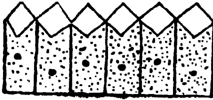
ক. কোষকেন্দ্র খ. ফাঁকা জায়গা
গ. সাইটোপ্লাজম ঘ. পুরু আবরণ

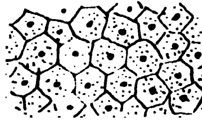
প্রত্যেক সেলের পৃথক সত্তা আছে যেমন বলা হোলো, তার কোনো একটি অবয়ব সম্বন্ধে তা বলা যায় না। অর্থাৎ সেল পৃথকভাবে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু তার কোনো অংশ তা পারে না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে জীবনের আসল ভিত্তি হোলো সেল।

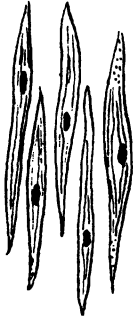
যে-কোনো বড়োগোছের প্রাণীর শরীরে কত সেল আছে শুনলে আশ্চর্য বোধ হবে। মানুষ খুব বড়ো জন্তু নয়—তবু একটি মানুষের রক্তের ভিতর ১৫,০০০,০০০ সেল আছে, তার মগজ

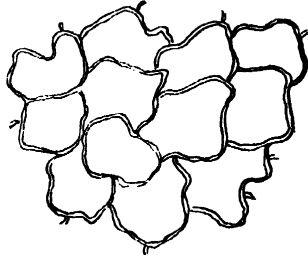
২,০০০,০০০,০০০ সেল দিয়ে তৈরী আর তার শরীরে সর্বসমেত থাকতে পারে, ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সেল।

প্রত্যেক জীবের মধ্যে এত কোটি কোটি সেল সুশৃঙ্খলভাবে এক নিয়মে চলে, এ বড়ো সহজ কথা নয়। একটি সাম্রাজ্য চালনা









৫. সেলের আকৃতি নানাবিধ হোতে পারে। কয়েক রকম নমুনা

করা এর কাছে কত তুচ্ছ। কিন্তু আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতবড়ো জগতের অধীশ্বর হয়েও জীব অধিকাংশ সময়ে সে-বিষয়ে সচেতন নয়, তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এই রাজকার্য চলতে থাকে।

জীবকোষ

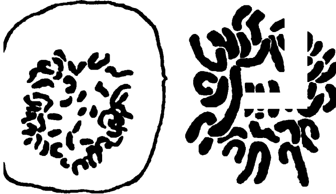
বিভাজন ও প্রজনন

প্রাণতত্ত্বের একটি গোড়াকার কথা হোলো প্রাণীই প্রাণীর জন্মদাতা, অর্থাৎ কোনো জীব আপনা থেকে জন্মাতে পারে না, বা জড়পদার্থের সংমিশ্রণে তাকে গড়া যায় না, জীব থেকেই জীবের সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্টির প্রণালী—বিভাজন।

এককোষী জীবেরা বংশবৃদ্ধি করে খুব সহজে। পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হোলেই তারা নিজেকে দু-ভাগ করে। বিভক্ত অংশদুটি বড়ো হয়ে উঠলেই তারা আবার নিজেদের দু-ভাগ করে ফেলে—দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি, আটটি থেকে ষোলোটি এই রকম ক'রে ক্রমাগত বেড়ে যায়। মা'র শরীরের অভ্যন্তরে অণ্ডকোষের একটিমাত্র সামান্য সেল এই প্রণালীতে সংখ্যা বৃদ্ধি করেই আমাদের এতবড়ো শরীর গড়ে তোলে।

ভাগ হবার সময় জীবকোষের ভিতরে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই সময় কতক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকার পর সাধারণত সে গোলাকার হবার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে কোষ-কেন্দ্রিকা দুটি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তাদের জায়গায় কোষকেন্দ্রের ভিতর কালো কালো গুঁড়ো দানার মতো কতকগুলি বস্তু ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। ক্রমশ সেগুলি গায় গায় লেগে সরু সুতোর মতো আকার ধারণ করে এবং অস্থির

হয়ে ঘুরে বেড়ায়। একটু পরে আবার স্থির হয়ে জোড়া লেগে অপেক্ষাকৃত মোটা এবং ছোটো ছোটো কয়েকটা কাঠির আকারে দু-দিকে লাইন করে দাঁড়ায়। এইগুলি ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমের নাম আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রজনন এবং বংশানুক্রম ব্যাপারে এইগুলির বিশেষ ক্রিয়া লক্ষ্য করার প্রয়োজন আছে। ক্রোমোসোমগুলি সুস্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষকেন্দ্র গলে গিয়ে সাইটোপ্ল্যাজমের সঙ্গে মিশে যায়। কোষকেন্দ্র ব'লে তখন আলাদা কিছু থাকে না। তার পরিবর্তে সেলের দুই মেরুতে দুটি তারার মতো বস্তু দেখা দেয় এবং সেই তারা দুটিকে খুঁটি ক'রে সরু সুতোর একটা লাটিমের মতো জিনিস (spindle) ক্রমশ গড়ে ওঠে। এই লাটিমকে সমান দু-ভাগে ভাগ ক'রে মাঝখানে ক্রোমোসোমগুলি লাইন করে দাঁড়ায়।



৬. ক্রোমোসোম

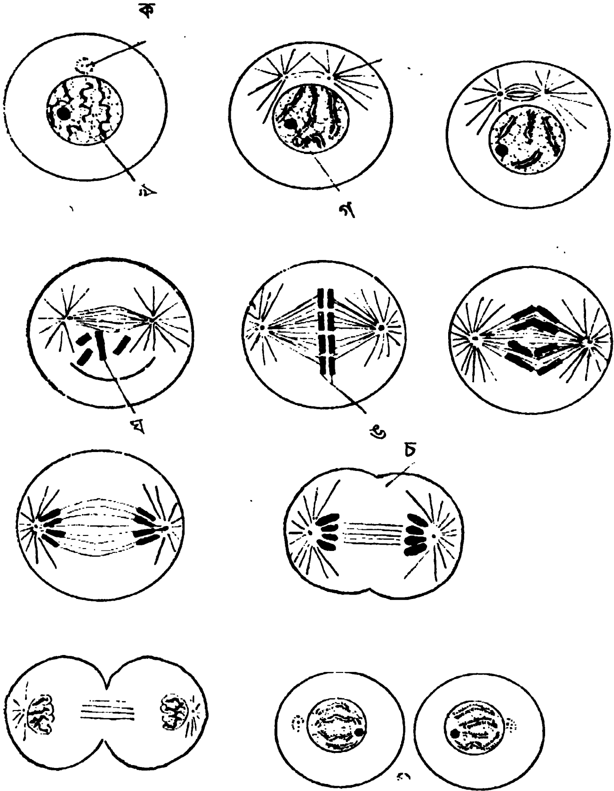
দুই হাজার গুণেরও অধিক বড়ো ক'রে দেখানো

ক. মানুষের সেলে ৪৮টি থাকে

খ. ব্যাঙের সেলে ২৬টি

পরিবর্তনের সূত্রপাত থেকে এই অবস্থায় পৌঁছতে ৮ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। এতক্ষণ বিভাজনের জন্য সেল নিজেকে প্রস্তুত করছিল মাত্র, এইবার আসল বিভাজনের প্রক্রিয়া শুরু

জীবকোষ



৭. সেলের বিভাজন-প্রণালী

জন্তুর দেহকোষ দেখে নকশা করা

ক. সেণ্ট্রোসোম খ. কোষকেন্দ্র গ. কোষকেন্দ্রিকা ঘ. ক্রোমোসোম ঙ. ক্রোমোসোমগুলি ভাগ হয়ে দুই লাইনে দাঁড়িয়েছে চ. ক্রোমোসোমের দুই ভাগ দুই মেরুর দিকে সরে গেছে ও সেলের কোমর সরু হোতে আরম্ভ করেছে—বিভাজনের পূর্ব অবস্থা

হয়। ক্রোমোসোমগুলি দু-ভাগ হয়ে ডবল লাইনে তখন দাঁড়ায়। লাটিমের সুতোগুলি ক্রোমোসোমের এক-একটি লাইনকে তাদের দিকের তারার কাছে যেন টানতে থাকে, লাইন দুটির মাঝে ফাঁক বাড়তে বাড়তে দু-দল ক্রোমোসোম ও দুটি তারা সেলের দুই মেরুতে গিয়ে জড়ো হয়। যখন ভিতরে এই ব্যাপার চলছে সেলের বাইরের আকারেরও পরিবর্তন হোতে থাকে। সেলের বাইরেকার খোলস (cell wall) হঠাৎ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং নানাদিকে ঠেলাঠেলি ক'রে শেষে কোমরের কাছটা সংকুচিত করতে থাকে। কোমর সরু হোতে হোতে সেলের দুই অংশ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই রকম ক'রে পূর্ণ-বয়স্ক একটি সেলের শরীর ভেঙে দুটি বাচ্ছা-সেল এতক্ষণে তৈরি হয়। সম্পূর্ণ বিভিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোমোসোমগুলি অনেক সময় মিলিয়ে যায় এবং কোষকেন্দ্র আবার গড়ে ওঠে।

উল্লিখিত প্রণালীতে একটি থেকে দুটি সেল জন্মাতে সব সমেত আধঘণ্টা আন্দাজ লাগে। নূতন বাচ্ছা-সেলদের মধ্যে কোষকেন্দ্র গড়ে উঠতে আরো প্রায় দু-ঘণ্টা লেগে যায়।

সেলের বিভাজন-প্রণালীর যে-বিবরণ দেওয়া গেল সাধারণ পাঠক যদি তার সব কথা মনে না রাখেন তবে ক্ষতি নেই। এই প্রণালীর মধ্যে মুখ্যভাবে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করবার আছে। বিভক্ত হবার আগে সেল চেষ্টা করে তার ভিতরকার বস্তু-অংশকে নানা উপায়ে উলটেপালটে ঘুঁটে ফেলবার। খাবার আগে শিশি ঝাঁকিয়ে আমরা যেমন ওষুধ

ভালো করে ঘুলিয়ে নিই, তেমনি সেলও তার প্রাণবস্তু মাখামাখি ক'রে মিশিয়ে নেয়। তার পর যখন ভাগ হয় একেবারে নিক্তির ওজনে সমান ভাগে ভাগ হয়। এত কাণ্ডকারখানার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, ক্রোমোসোমগুলি সংখ্যায় ডবল হয়ে গিয়ে বিভাজনের অনতিপূর্বে অর্ধেক একটি তারার দিকে, বাকি অর্ধেক অন্য তারার দিকে, মাতৃকোষের দুই সীমান্তে জড়ো হয়।

এইভাবে মাতৃকোষের শরীরবস্তু উত্তরাধিকারসূত্রে সন্ততিদের মধ্যে সমানভাগে বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়। প্রোটোপ্লাজমের সমগ্র বস্তুর প্রথমে ওলটপালট হয়ে মেশা, পরে সমান দুই ভাগে ভাগ হওয়া—বিভাজন-প্রণালীর এই হোলো সারমর্ম এবং আমাদের এই কথাটাই মনে রাখলে চলবে।

প্রাণবান ও জড় বস্তুর বৃদ্ধির মধ্যে এইখানে মস্ত তফাত। একটা বাড়ি বড়ো করে তুলতে গেলে ক্রমাগত একটার পর একটা ইট সাজাতে হয়। বাইরে থেকে বস্তুপুঞ্জের যোগে তার আয়তন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু প্রাণীমাত্রেই নিজের বৃদ্ধিসাধন করে ভিতর থেকে।

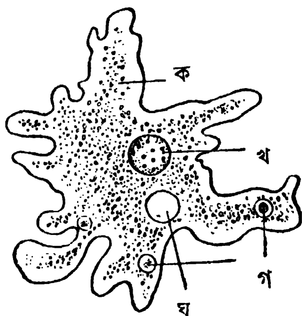
এককোষী থেকে বহুকোষী জীবের উৎপত্তি

গাছপালা জন্তুজানোয়ার ইত্যাদি সব রকমের জীবই অতিশয় ক্ষুদ্র সেলের সমষ্টি। একটা বাড়ি যেমন হাজারো ইট দিয়ে তৈরী, তার প্রত্যেক ইট যেমন আলাদা ক'রে গাঁথা, কিন্তু সব মিলেই তবে গোটা দালান; আমাদের শরীর তেমনি কোটি কোটি সেল দিয়ে গড়া। তারা প্রত্যেকটি প্রাণবান কিন্তু তাদের সকলের সমষ্টিতে গঠিত হয় সম্পূর্ণ একটি নূতন এবং ভিন্ন প্রাণী। একই রকমের ইট সাজিয়ে তৈরী প্রত্যেক বাড়িতে যেমন বিভিন্ন রকমের ঘর থাকে, প্রাণীদেরও তেমনি হরেক রকম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, কিন্তু সকলেরই মূলে সেই সেল।

এককালে সামান্য আচ্ছাদনের নিচে মানুষ বাস করত, ক্রমশ চালা ঘর, পাকা দালান, উচ্চ অট্টালিকা গড়ে উঠল। প্রাণীর ক্রমবিকাশও সেই রকম সামান্য থেকে; একটিমাত্র সেল থেকে তার উৎপত্তি, পরে দেখা দিয়েছে এত বিচিত্র রূপের সৃষ্টি। আদিম অবস্থার জীব কী রকম ছিল তার নমুনা সৌভাগ্যবশত পৃথিবীতে এখনো রয়ে গেছে। সোঁতার ধারের শ্যাওলাপড়া ঘোলা জলের একটি ফোঁটাকে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে সহজেই নজরে পড়বে তার ভিতর কতকগুলি জীবাণু। তাদের কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নেই, হড়হড়ে নালের মতো পদার্থ। এই জীবাণুর নাম অ্যামিবা, এর কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই,

জীবকোষ

একটিমাত্র কোষকেন্দ্র সমেত এক ফোঁটা প্রোটোপ্ল্যাজম। বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের অভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস খাওয়া-দাওয়া সব কাজই তাকে অতি সহজ উপায়ে সারতে হয়। এমন কি, জননক্রিয়ার উপায়ও সরল; বংশবৃদ্ধির দরকার হোলে নিজেকে দুখানা ক'রে ফেললেই তার চলে। অত্যন্ত সহজ জীবন-যাপন বলতে হবে। সেইজন্য অ্যামিবা আদিম অবস্থাতেই থেকে গেছে, জীবজগতের সবচেয়ে নিম্নস্তরে তার স্থান। একটিমাত্র কোষ নিয়ে তার দেহ, বেশি বড়ো হোতে পারে না। বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ অঙ্গ নেই ব'লে জীবনসংগ্রামে পটুতার অভাব। পৃথিবীর আনাচেকানাচে কোনোরকমে সে বেঁচে আছে।

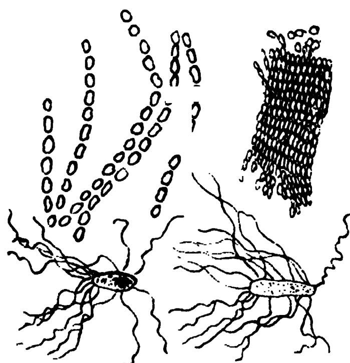


৮. অ্যামিবা

ক. সাইটোপ্লোজম খ. কোষকেন্দ্র গ. খাদ্যদ্রব্য রাখার গর্ত ঘ. হাওয়া ভরা গর্ত

এই রকম অ্যামিবার মতো নগণ্য হয়ে থাকা বেশি দিন চলে না, উন্নতি চাই। উন্নতির প্রথম ধাপ হচ্ছে বড়ো হওয়া। বড়ো কী ক'রে হওয়া যায় তার পরীক্ষা চলতে লাগল জীব-ইতিহাসের গোড়াতেই। দেখা গেল, কেবল আকার বাড়িয়ে বিশেষ লাভ নেই, তাতে বলবৃদ্ধি হয় না। তা ছাড়া একটিমাত্র কোষ কতই বা বড়ো হবে। কেবল সংখ্যা বাড়িয়ে যে বড়ো

হওয়া যায় না, সমবায়ের দ্বারা যে বলবৃদ্ধি হয় এই তথ্যটির উপলব্ধি যেই হোলো তখন থেকেই আসলে জীবজগতের উন্নতি শুরু। পথ খুলে গেল হাজারো চেষ্টার। অ্যামিবার পরের ধাপেই দেখি কয়েক শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়া (Bacteria)। তারাও এক-কোষী জীব। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় তারা নিজেদের সুবিধার জন্য দলবৃদ্ধি করেছে সেল পর-পর জুড়ে; তারা তখন পৃথকভাবে না থেকে কয়েকটিতে মিলে একসঙ্গে বিচরণ করে। কয়েক শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়া সেইজন্য দেখতে যেন একহারা মালা বা এক টুকরা শিকলের মতো।

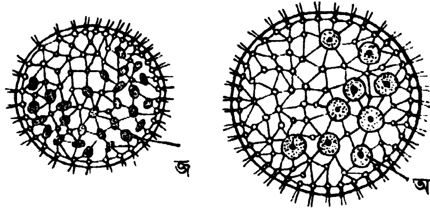


৯. কয়েক রকম ব্যাকটিরিয়া

অ্যামিবার মতো আর-একটি জলজীব—ভলভক্স (volvox)—অন্য উপায়ে বড়ো হবার চেষ্টা করেছে, সেলগুলিকে এলোমেলো জটলা পাকিয়ে। ব্যাকটিরিয়ার মতো এদের প্রত্যেক সেলের স্বাধীন সত্তা নেই অথচ তেমন বন্ধনও নেই। একত্রে জড়ো হয়ে থাকার কোনো বিশেষ সুবিধার আভাস পেয়েই যেন তারা একত্রে কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা দেহ গড়ে তুলেছে।

অ্যামিবা, ব্যাকটিরিয়া, ভলভক্স প্রভৃতি একেবারে নিম্নস্তর

ছাড়িয়ে শ্যাওলা ও ছাতা জাতীয় সবজির গঠন পরীক্ষা করলে দেখতে পাব তাদের দেহে বেশ বাঁধন ধরেছে, ভলভক্সের মতো যেমন-তেমন জটলা আর নয়, পাকা গাঁথনির ইটের মতো এদের সেলগুলি কৌশলে সাজানো। এমন কি, সেলগুলি সব এক রকম আর নেই, তাদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতির ভেদ দেখা দিয়েছে। ধাপে ধাপে যতই উচ্চস্তরে উঠব সেলদের মধ্যে জাতিভেদের পরিচয় আরো বেশি করে পেতে থাকব। যে-অঙ্গের যে বিশেষ কাজ সেই অঙ্গের কোষগুলিও সেই কাজের উপযোগী হবার চেষ্টা করে ক্রমাগত। তার জন্য নিজেদের গঠনের অনেক পরিবর্তন করে নিতে হয়। গাছের বিভিন্ন অঙ্গের কোষ অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে দেখতে পাব কাঠের বা ছালের বা পাতার সেলের বাইরের চেহারার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই, ভিতরের গঠন অবশ্য সকলেরই এক।



১০. ভলভক্স
জ. জননকোষ অ. ডিম্বকোষ

অতি ক্ষুদ্র অ্যামিবার মতো একটি এককোষী জীব থেকে ক্রমশ এত বিচিত্র এবং অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জীবজন্তুর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বড়ো হবার কতকগুলি অসুবিধা আছে। একা একটি সেল



১১. নানাপ্রকার সামুদ্রিক জীব
নিম্নস্তর প্রাণীর সহজ সূত্রপাত থেকে জটিলতার পথে প্রগতি

নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ। তাকে কোনো এক জায়গায় ঘা দিলে সমগ্র দেহে তার সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু এইরকম অনেকগুলি সেল মিলে যখন একটি দেহ গঠন করে তখন সেলদের পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র কিছু না থাকলে বাইরে থেকে কোনো অভিঘাত সমগ্রভাবে সে অনুভব করবে কী করে। কয়েকটি সেল হয়তো খাবার সংগ্রহের ভার নেয় কিন্তু সেই খাদ্য শরীরের অন্য সেলগুলির মধ্যে পৌঁছয় কী ক'রে। অনেককে নিয়ে কারবার করতে গেলেই রাস্তাঘাট, হাটবাজার, পোস্ট-টেলিগ্রাফ কত কিছুর দরকার পরস্পরের সম্বন্ধ রক্ষার জন্য। এক কথায় এ-রকম ব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে কলেবর-বন্ধন (organisation)। একত্রে থাকতে গেলেই সংঘবদ্ধ হওয়া চাই। এককোষী ছেড়ে জীবজগতে যেই বহুকোষী প্রাণীর আবির্ভাব হোতে লাগল তখনই কলেবর-বন্ধনের দিক থেকে দেখতে পাই :

(১) দৈহিকক্রিয়া ও জননক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ। জীবন যাপনের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম চালাবার উপযোগী এক শ্রেণীর সেল ও গুটিকতক সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর সেল যারা প্রজননে ব্রতী।

(২) পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার জন্য একটির সঙ্গে আর-একটি সেলের ধারাবাহিক বন্ধন। নানারকম তন্তু, নালী ও উপনালী শরীরের এই আঙ্গিক যোগ রক্ষা করে।

(৩) উল্লিখিত শারীরিক যোগাযোগ ছাড়াও চেতনার যোগ। চেতনাশক্তি সমস্ত শরীরময় ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থার জন্য নার্ভমণ্ডলীর (nervous system) সৃষ্টি।

প্রাণতত্ত্ব

অ্যামিবাজাতীয় এক কোষী জীব ছাড়া অন্য সমস্ত প্রাণীর শরীর বহুকোষে গঠিত বলা হয়েছে। প্রত্যেকটির সেলের স্বতন্ত্র সত্তা আছে, এমন কি মূল শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তারা প্রত্যেকে বেঁচে থাকতে পারে। অথচ এতগুলি আধা-স্বাধীন সেলের সমষ্টিতে গড়া যে-প্রাণী তারও আবার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। এই ব্যক্তিত্ব এত সুস্পষ্ট যে, একই মায়ের সন্তানের মধ্যে প্রত্যেকে বিভিন্ন। চেতনাশক্তির অভিব্যক্তি না হোলে এইভাবে এক স্বাতন্ত্র্যকে নির্ভর ক'রে দ্বিতীয় স্বাতন্ত্র্য সম্ভব হোত না। এতগুলি সেল একত্রে ধরে রেখে এক নিয়মে এক ইচ্ছার বশে চালনা করার প্রয়োজনে চেতনাশক্তি ও তার বাহন বোধনাড়ীতন্ত্র উদ্‌বুদ্ধ।

অ্যামিবার মতো নগণ্য এককোষী জীব থেকে কালক্রমে কী ক'রে জীবজগতের চূড়ামণি মানুষ গড়ে উঠল সেই ইতিহাসের কথা জীববিজ্ঞানের প্রধান বক্তব্য। সহজ ক্ষুদ্র দেহ নিয়ে আরম্ভ ক'রে ক্রমশ কী ক'রে বৃহত্তর ও জটিলতর জীব ধাপে ধাপে দেখা দিতে লাগল তার প্রগতির সবিশেষ ইতিহাস এই স্বল্পায়তন বইয়ের মধ্যে বিবৃত করা সম্ভব নয়, সেইজন্য যেসব সাধারণ প্রণালী বা নিয়মে এই ক্রমোন্নতি হয়েছে মোটামুটিভাবে তারই আলোচনা করা যেতে পারে।

যতদিন পর্যন্ত এককোষী জীবেরা নিজেদের কেবল দু-ভাগ করা ছাড়া বংশবৃদ্ধির অন্য উপায় উদ্ভাবন করেনি, ততদিন প্রাণীদের মধ্যে বৈচিত্র্য বিশেষ দেখা দেয়নি পৃথিবীতে। যখন থেকে

স্ত্রী-পুরুষ দুজনের মিলনে বংশবৃদ্ধি হোতে শুরু করল তখন থেকে প্রাণীজগতের দ্রুত উন্নতির পথ সহজ হোলো। একটি সেলকে ঠিক সমান ভাবে দু-ভাগ করলে খণ্ডদুটি জনয়িতার হুবহু নকল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যে-স্থলে জনক-জননী দুটি পৃথক ব্যক্তি থেকে সন্তানের জন্ম, সে স্থলে জন্মদাতাদের সঙ্গে সন্তানের ঐকান্তিক মিল থাকতে তো পারেই না, সন্তানদের পরস্পরের মধ্যেও একজনের সঙ্গে আর-একজনের যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। জীবজগতে এত বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য উদ্ভবের মূল কারণ সেইজন্য মনে হয় যৌনপ্রণালীতে বংশবৃদ্ধি।

বৈচিত্র্যপ্রকাশের সাধারণভাবে যে-কারণ উল্লেখ করা হোলো তা সত্য হোলেও আমাদের জানতে বাকী থেকে যায় জীবজন্তুর শরীরের এত রকমের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়, অবয়ব, যন্ত্রাদি কী ক'রে সৃষ্টি হোলো। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় জলজন্তুই কেবল ছিল, কেননা ডাঙা তখনো জেগে ওঠেনি। অ্যামিবা অতিক্রম ক'রে একাধিক কোষবিশিষ্ট জলজীব যখন দেখা দিল তারা স্থিরভাবে জলে না ভেসে কোনো একদিকে জল ঠেলে যেতে চেষ্টা করতে লাগল। সেই অবস্থায় তাদের সামনের দিকের সেলগুলি খাবারের সন্ধান সব-প্রথমে পেতে লাগল এবং বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে সব-প্রথম তাদেরই সংঘর্ষ হোতে লাগল। সামনের দিকের সেলগুলি কাজেই খাবার সংগ্রহ করা, শত্রুকে এড়ানো বা দমন করা, দিক নির্ণয় করা প্রভৃতি আবশ্যক কাজগুলির ভার নিয়ে নিজেদের বিশেষভাবে তার উপযোগী ক'রে তোলবার চেষ্টা করতে

লাগল। এই চেষ্টার ফলে জীবদেহের মস্তিষ্ক আস্তে আস্তে গড়ে উঠল। প্রথমে আহার্য বস্তু ভিতরে নেবার জন্য মুখগহ্বর ও গলনালী, পরে চোখ-কান প্রভৃতি বাহেন্দ্রিয়গুলি এবং সঙ্গে সঙ্গে মগজ দেখা দিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিন্নতা বা পরিবর্তন অনুসারে জীবদেহের এই সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যও বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রয়োজনবোধে লেজ, ডানা, হাত, পা প্রভৃতি বহিরঙ্গ এবং পাকস্থলী, অন্ত্র, ফুসফুস, হৃদয় প্রভৃতি বিভিন্ন অন্তরঙ্গগুলি প্রকাশ হোলো।

জীবদেহের সেল-সমষ্টিকে একটি রাষ্ট্রসেনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। আধুনিক যুদ্ধে নানাপ্রকারের ফৌজ নিযুক্ত হয়; আকাশযুদ্ধে বিমানবাহিনী, জলযুদ্ধে নৌবহর, ডাঙায় ট্যাঙ্কবোর, অশ্বারোহীদল ও পদাতিকবাহিনী, খাবার সরবরাহের জন্য রশদ-বিভাগ, রাস্তাঘাট বানাবার জন্য মাইনার্স ও স্যাপার্স ইত্যাদি নানা কাজের জন্য বিভিন্নপ্রকার ফৌজের ব্যবস্থা আছে। আমাদের শরীরের সেলের রাজত্বেও এই ধরনের ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। এক-এক রকমের সেল দলবদ্ধ হয়ে এক-একটি অঙ্গ বা যন্ত্র তৈরি করে তুলেছে। যার যেমন কাজের ভার তারা সেই কাজের উপযোগী হবার জন্য নিজেদের গঠন পরিবর্তন করে ফেলতে চেষ্টা করে। মাংস-পেশীর সেলগুলি খুব সরু লম্বা হোলো তাদের বিশেষ কাজের সুবিধার জন্য; রক্তের সেলের লম্বা হবার প্রয়োজন নেই ব'লে তারা চাকা-চাকা থাকল রক্তপ্রবাহে চলাচলের সুবিধার জন্য।

জীবকোষ

জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য এবং সেই সঙ্গে কাজের ভাগাভাগি এই প্রণালীতে গড়ে উঠেছে।

জীবজন্তুর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায় বিজ্ঞানী-দের কাছে এখন সুস্পষ্ট। ধাপে ধাপে কী প্রণালীতে, কেমন ক'রে, যুগ যুগ ধ'রে ক্রমশ প্রগতির পথে জীবনধারা এগিয়ে চলেছে তার সমস্ত সূত্র তাঁদের জানা হয়ে গেছে। প্রাক্ যুগে অ্যামিবার ন্যায় প্রোটোজোয়া, ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য এককোষী জীব নিয়ে জীবজগৎ শুরু হয়। ক্রমশ ভলভক্স, স্পঞ্জ, স্পাইরোগাইরা, জেলিমাছ, সামুদ্রিক অ্যানিমোন প্রভৃতি খুব সাদাসিধা অথচ একাধিক-কোষী জলজীবের উৎপত্তি হয়। এই সব জীবে মস্তিষ্ক বা অন্য বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কোনো চিহ্ন দেখা দেয়নি। ক্রিমির মতো এক রকম চ্যাপটা পোকার (flat worm) মস্তিষ্কের সূত্রপাত হয় এবং রাউণ্ড ওয়ার্মে (round worm) রক্ত ও অন্ত্রনালীর অল্পস্বল্প ইঙ্গিত দেখা যায়।

বহুকাল পর্যন্ত এই সব ক্ষুদ্র জলচরেরা পৃথিবীর বিস্তৃত জলরাশি প্রাণময় করে রেখেছিল। এদের কোনো কোনো জাতের মধ্যে অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূচনা পরবর্তী কালে দেখা যায় বটে কিন্তু একটি বিশেষ দেহাংশের অভাব থাকাতে এই জাতীয় জীবমাত্রকেই invertebrate অর্থাৎ মেরুদণ্ডহীন বলা হয়। জলের মধ্যে দ্রুত চলাচলের প্রয়োজনের তাড়নায় মাছদের মধ্যে প্রথম শিরদাঁড়া দেখা দিল। শিরদাঁড়া হবার পর থেকে প্রাণীদের আরো তাড়াতাড়ি উন্নতির পথ যেন খুলে গেল।

তাদের মধ্যে তখন কেউ কেউ জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে পড়ল। জলের মাছ থেকে ডাঙার সরীসৃপ একটি ধাপমাত্র, সহজেই এই পরিবর্তন হোতে পেরেছিল। এখনো কয়েক রকম মাছ দেখা যায় যারা ডাঙার উপর দিয়ে কোনোমতে চলে যেতে পারে।

টিকটিকি-গিরগিটি জাতের জন্তুরাই প্রথমে পৃথিবীর জমি দখল ক'রে রাজত্ব বিস্তার করে। ছোটো গিরগিটি আর প্রকাণ্ড ডাইনোসর একই জাতের। এরা ডাঙা জমি অধিকার ক'রেই ক্ষান্ত হোলো না, আকাশে ওড়বার চেষ্টাও করতে লাগল। সরীসৃপের পরেই তাই পাখি সৃষ্টি হোতে দেখা যায়। হাতের বদলে ডানা তৈরি ক'রে ফেলে তারা স্বচ্ছন্দচিত্তে বিমানবিহারী হয়ে পড়ল। এদিকে ডাঙার জন্তুদের মধ্যে স্তন্যপায়ী জাতের সৃষ্টি হয়ে, ক্রমোন্নতির পথে তারা একটা বড়ো রকম ধাপ এগিয়ে গেল। কুকুর, ঘোড়া, গোরু, বাঁদর প্রভৃতি জন্তুদের আবির্ভাব হোলো। তারপর জন্তুজানোয়ার থেকে ক্রমশ মানুষ কী ক'রে গড়ে উঠল, মানুষের কাছে সে একটা গুরুতর তথ্য হোলেও এ-কথা বলতেই হবে যে, খুব হাল আমলেই এটা হয়েছে এবং ক্রমবিবর্তনের লক্ষ লক্ষ যুগব্যাপী ইতিহাসে সে একটি অতি নগণ্য অধ্যায়। জন্তুদের উল্লিখিত ধারায় ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিদ-জগতও ক্রমশ গড়ে উঠেছে। এদের বেলাতেও সামান্য ও সহজ রকমের আরম্ভ থেকে ক্রমে ক্রমে অভিনব জটিলতার সৃষ্টি হয়ে গাছপালার এত বৈচিত্র্য হয়েছে।

দেহক্রিয়াতত্ত্ব

(জন্তুর)

অ্যামিবা বা ব্যাকটিরিয়ামের দেহগঠন বোঝা সহজ। এই জাতীয় জীবের একটিমাত্র সেল; খাওয়াদাওয়া, নিশ্বাসপ্রশ্বাস, জীবনধারণের যাবতীয় কার্যপ্রণালী, বিশেষ কোনো যন্ত্রের বিনা সাহায্যে অতি সহজ উপায়ে তারা চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ক্রমবিবর্তনের ফলে উচ্চাঙ্গের জীবজন্তুদের দেহ যন্ত্রবহুল হয়ে পড়েছে—শরীরচালনার প্রত্যেক কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ অবয়ব বা যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। শরীরের গঠন এবং তার অন্তর্গত প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যপ্রণালী ভালো করে বুঝতে গেলে অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি জানা দরকার। দেহবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম আলোচনার ভিতর প্রবেশ না ক'রে শরীরচালনার মোটামুটি নিয়মগুলি বোঝবার আপাতত চেষ্টা করা যাক। এই উদ্দেশ্যে মানুষের শরীরের উদাহরণ অধিকাংশস্থলে দিলে বোধ করি অন্যায় হবে না। জন্তুর শরীরে যে-সব যন্ত্র আছে মানুষেরও তা মোটামুটি আছে, উপরন্তু মানুষের বেলায় কতক বিষয়ে (বিশেষত নার্ভমণ্ডলীর) অনেক উন্নতি দেখতে পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে মানুষের শরীরক্রিয়া সম্বন্ধে যে আলোচনা করা যাবে উন্নতশ্রেণীর জন্তুমাত্রে তার অধিকাংশ বিবরণ বা নিয়ম খাটবে। উদ্ভিদের দেহতত্ত্ব সম্পূর্ণ পৃথক—তার বিষয় পরে বলা হবে।

সঞ্চলন

জড় বস্তুর সঙ্গে জীবের একটি প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই যে জীব সচল। গাছপালা বাদ দিলে চলাফেরাটাই অন্য প্রাণী মাত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ বলা যেতে পারে।

জন্তুদের সেইজন্য নড়াচড়ার উপযোগী নানা রকম অঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। মাছের লেজ, পাখনা, মায় সমস্ত শরীরের গঠন জলের মধ্যে দ্রুত সন্তরণের বিশেষ উপযোগী। আকাশে ওড়ার পক্ষে পাখির ডানার কী চমৎকার গড়ন তা আমরা এখন বেশ বুঝতে পারছি। উড়ন্ত জাহাজের (aeroplane) যতই উন্নতি হচ্ছে তার চেহারা ততই পাখির শরীরের অনুরূপ হয়ে আসছে। ডাঙার জন্তুরাও বড়ো কম যায় না; ঘোড়া, কুকুর, হরিণ বেশ দ্রুত ছুটতে পারে; দুটিমাত্র পা নিয়ে মানুষও ইচ্ছে করলে তাদের সঙ্গে অনেকটা পাল্লা দিতে পারে। এদের তুলনায় গাছপালা নিতান্ত স্থাণু, কিন্তু তাদের একেবারেই যে গতিবিধি নেই তা নয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সবসুদ্ধ নড়তে না পারলেও গাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে নড়ে বেড়াতে পারে. তা কোনো লতার বেয়ে ওঠবার প্রণালী লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে।

জীবদের চলবার কৌশল নানাবিধ :

(১) শামুক চলে টেনে টেনে, শরীরের মাংসপেশীর একবার সংকোচন ও পরে প্রসারণের দ্বারা। সাপেরও চলার প্রণালী ঐ-রকম।

(২) যাদের পা আছে তারা ঠেলে চলে। শক্ত মাটিকে ভর

(lever) ক'রে ঠেলে এগিয়ে যায়। সেইজন্য যেখানে ভালো লিভার পাবার উপায় নেই, যেমন জলের মধ্যে বা নরম কাদার উপর, তারা চলতে পারে না।

(৩) জল ঠেলে মাছ চলে। এতেও লিভারের দরকার, কিন্তু তরল পদার্থে লিভার কম পাওয়া যায় ব'লে ঠেলবার অঙ্গগুলি চওড়া করতে হয়েছে। দাঁড়ের মতো একবার ডাইনে আর-একবার বাঁয়ে ঠেলা মেরে মাছ সাঁতার কাটে।

(৪) দু-দিকে সমানভাবে ঠেলা মেরে চলা ; যেমন চলে জলের মধ্যে কচ্ছপ পায়ের সাহায্যে, আকাশে পাখি বা প্রজাপতি ডানায় ভর ক'রে।

চলাচলের জন্য যেমনই ব্যবস্থা থাক্ না কেন, ঠেলা মারার দরকার ; সেটা করতে গেলে শরীরে এমন সেল থাকা চাই যা রবারের মতো সহজে ছোটো বড়ো হোতে পারে। জন্তুদের দেহের এই সংকোচনশীল মাংসল অংশকে পেশী (muscle) বলে। পেশী দু-রকমের হয় :

(১) স্বায়ত্ত পেশী (Voluntary muscle)—এর সেল-গুলি সুতোর মতো সরু ও এক ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। মানুষের হাতের বাইসেপ (biceps) পেশী পাঁচ লক্ষ আন্দাজ এই শ্রেণীর সেল দিয়ে তৈরী। সেলগুলি একসঙ্গে গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকে ব'লে মাংসপেশী দেখতে যেন পাকানো দড়ির মতো।

স্বায়ত্ত পেশীর সংকোচন প্রসারণ আমাদের ইচ্ছাধীন। এদের কাজ হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হাড়গুলিকে দরকার মতো নাড়ানো।

নাড়াবার সুবিধার জন্য পেশীর একদিক একটা হাড়ে, অন্য দিক অন্য হাড়ে আটকানো থাকে। যখন যেদিকে সংকুচিত হয় তখন সেই দিকে হাড়কে টেনে আনে। জন্তুজানোয়ারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যা কিছু চালনা উক্তপ্রণালীতে হাড় ও মাংসপেশীর সহযোগে হয়। আমাদের শরীরে কম ক'রে দু-শো স্বায়ত্ত মাংসপেশী আছে।

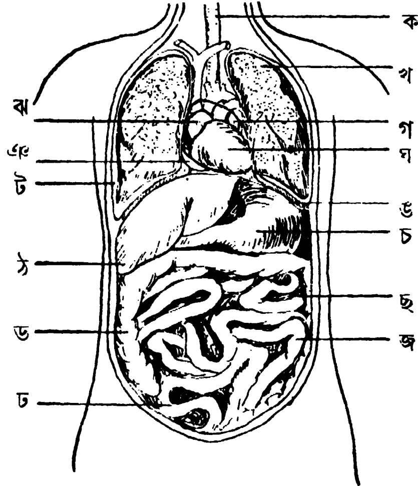
এই শ্রেণীর মাংসপেশীর খুব তাড়াতাড়ি ছোটো বড়ো হবার ক্ষমতা দেখা যায়। মগজ থেকে হুকুম পেলেই এরা মুহূর্তের মধ্যে যেমন সংকুচিত হোতে পারে তেমনি আবার দ্রুত প্রসারিত হোতে পারে। আমাদের শরীরের কোনো কোনো স্বায়ত্ত মাংস-পেশী এক সেকেণ্ডের মধ্যে অনায়াসে তিনশো বার অর্থাৎ ঘণ্টায় ১০,৮০,০০০ বার ছোটো-বড়ো হোতে পারে। মানুষের তৈরী খুব কম যন্ত্রই আছে যার গতি এত দ্রুত।

(২) অনায়ত্ত পেশী —(Involuntary muscle) এদের বিশেষ গুণ এই যে, এদের চালনা করবার জন্য দেহীর ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হয় না—নিজে থেকেই তারা সংকুচিত ও প্রসারিত হোতে পারে। গতিও এদের অপেক্ষাকৃত ধীর। এই পেশী-গুলির ব্যবহার শরীরের অন্তরিন্দ্রিয়সমূহে, যাদের নড়াচড়া আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নয়। পাকস্থলী, অন্ত্র, হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতি দেহযন্ত্রের যে স্পন্দন (rhythmic movements) তা আমাদের সম্পূর্ণ অগোচরে চলতে থাকে। শরীরের ভিতরের এই সব কলকবজা চলে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনায়ত্ত মাংসপেশীর সাহায্যে।

শ্বাস-প্রশ্বাস

জীবমাত্রেরই জীবন ধারণের জন্য শক্তির দরকার, সেই শক্তি যে-কোনো উপায়েই হোক না কেন জুগিয়ে দেয় অক্সিজেন। হাওয়াতে অক্সিজেন আছে অফুরন্ত পরিমাণে। জীবদের পক্ষে এই অত্যাবশ্যকীয় পদার্থটি সেইজন্য হাওয়া থেকে নেওয়াই খুব সুবিধা।

জন্তুদের শরীরের মধ্যে হাওয়া প্রবেশের দ্বার নাকের দুই গর্ত। গর্ত দুটি নাকের শেষভাগে গলার কাছে এসে মিশেছে একটি মোটারকম নালিতে। এই



১২. মানুষের শরীরের ভিতরের কয়েকটি প্রধান ইন্দ্রিয়

ক. অন্ননালি খ. ফুসফুস্ (বাঁদিকের থলি) গ, ঘ, ঝ, হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ঙ. ডায়াফ্রাম চ. পাকস্থলী ছ. পেটের গহ্বর জ. ক্ষুদ্রান্ত্র ঞ. বুকের গহ্বর ট. ফুসফুসের বাইরেকার আবরণ, প্লুরার গহ্বর ঠ. যকৃত ড. বৃহৎ অন্ত্র ঢ. অ্যাপেণ্ডিকস

শ্বাসনালি (trachea) $\frac{3}{4}$" ব্যাসের পাইপের মতো এবং গলার কাছ থেকে সোজা নেমে গেছে ফুসফুসে। হৃদয়ের একটু পিছনে দুই পাশে

ফুসফুসের দুই থলি। ফুসফুসের নিকটবর্তী হয়ে শ্বাসনালিকে সেইজন্য দু-ভাগ হোতে হয়েছে এই দুটো থলির সঙ্গে যুক্ত হোতে। উপনালি দুটিকে ব্রঙ্কাই (bronchi) বলে। ব্রঙ্কাই উপনালি অসংখ্য বার ভাগ হয়ে অত্যন্ত সরু সরু সূক্ষ্মনালির জালিতে ফুসফুসের ভিতর ছড়িয়ে গেছে এবং শেষ হয়েছে alveoliতে। ফুসফুসের ভিতরটা স্পঞ্জের মতো। তার ফোঁপরা মাংসপিণ্ডের সর্বত্র অসংখ্য শিরা-উপশিরা নালি-উপনালি জালের মতো alveoli গুলিকে আবৃত করে রেখেছে। রক্তবাহী শিরা এবং ধমনী সেখানে যুক্ত হয়েছে হৃদয় থেকে। তাদের সূক্ষ্ম নালির পাশাপাশি অবস্থিত শ্বাসনালির শেষ সীমান্তগুলি। শিরার দ্বারা আনীত দূষিত রক্ত ফুসফুসের হাওয়া থেকে অক্সিজেন নিয়ে তাজা হয়ে চলে যায় ধমনীতে। লাল রক্তকণিকার মধ্যে যে লাল রং আছে—হেমোগ্লোবিন (haemoglobin)—তার অক্সিজেন গ্রহণ করার অদ্ভুত ক্ষমতা। রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যাগ করে। শ্বাস নেবার সময় অক্সিজেন ফুসফুসের ভিতর ঢোকে, রক্ত তা নিয়ে যে CO_2 পরিত্যাগ করে, নিশ্বাসের সঙ্গে সেটা নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়। শিরার দ্বারা আনিত রক্তে CO_2 অধিক থাকে এবং alveoliর বায়ুতে O অধিক থাকে। ফুসফুসের মধ্যে এই দুই গ্যাসের বিনিময় হয়। শ্বাসবায়ুতে শতকরা ২০ ভাগ O থাকে আর '০৪ ভাগ CO_2 থাকে, এই বিনিময়ের ফলে প্রশ্বাস বায়ুতে ১৬ ভাগ O এবং ৪ ভাগ CO_2 হয়ে যায়।

নাক থেকে ফুসফুস পর্যন্ত হাওয়া যাবার পথ রয়েছে বটে কিন্তু

প্রতিনিয়ত সমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চলে কী ক'রে। হৃদ্‌যন্ত্রের মতো ফুসফুসের আপনা থেকে স্পন্দনের কোনো ব্যবস্থা নেই। হাওয়া আমাদের টেনে নিতে হয়, আপনা থেকে ফুসফুসে ঢোকে না। পাঁজরের হাড়গুলি নরম ব'লে তাদের গায়ে যে মাংসপেশী লাগানো আছে তাদের সংকোচন বা প্রসারণের সঙ্গে সমস্ত পাঁজর সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। পাঁজরের হাড় এমন একটু বাঁকাভাবে সাজানো ও পেশীগুলির বন্ধন এমন কৌশলে যে (কথাটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগতে পারে) মাংসপেশীর সংকোচনেই আমাদের বুক ফুলে' ওঠে, প্রসারণে নয়। বুক ফোলালেই নাক দিয়ে হাওয়ার টান পড়ে, তাকেই শ্বাস নেওয়া বলি। এ ছাড়া আর এক উপায়ে বুক ফোলানো যায়। বুকের গহ্বর ও পেটের গহ্বরকে পৃথক করে রাখে মধ্যে একটি পাতলা ও গম্বুজাকৃতি মাংসের পর্দা (diaphragm)। এই পর্দার গায়ে যে-সব পেশী আছে তারা পর্দাটার আকার পরিবর্তন করতে পারে। এই পরিবর্তনের ফলে যখন বুকের ভিতরকার আয়তন বেড়ে যায়, তখন শ্বাসনালি দিয়ে ফুসফুসের ভিতর হাওয়া ঢুকতে চায়। এই দু-রকম প্রণালীর সাহায্যেই আমরা শ্বাস নিই। স্ত্রীলোকেরা বেশির ভাগ পাঁজরের সাহায্যে শ্বাস নেয়, পুরুষরা ডায়াফ্রাম দাবিয়ে সেই কাজ করে।

শ্বাসের সঙ্গে যে-হাওয়া আমরা ফুসফুসের ভিতর টেনে নিই তা সব সময় পরিষ্কার নির্মল হাওয়া নাও হোতে পারে। আকাশের হাওয়াতে ধোঁয়া, ধুলো, ব্যারামের বীজ কত কিছু

থাকে। সেগুলি ফুসফুসের রক্তের সঙ্গে মিশলে ক্ষতি করতে পারে। দূষিত হাওয়া ফুসফুসে ঢোকবার আগে তাকে শোধন করে নেবার জন্য নাকের মধ্যে ব্যবস্থা রয়েছে। নাকের ভিতরে চুল আছে, তার কাজ হচ্ছে ধুলোর কণা আটকে দেওয়া। নাকের ভিতরটা তা ছাড়া সর্বদা ভিজে ও চটচটে থাকে তাতেও ধুলো প্রভৃতি যে-সব ক্ষতিকর পদার্থ হাওয়ার সঙ্গে চলে আসে সেগুলি আটকে যায়, ফুসফুসে ঢুকতে পারে না। এইজন্যই মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে ডাক্তাররা বারণ করেন, নাক দিয়ে নিশ্বাস নিলে হাওয়ার দোষ অনেকটা কেটে যায়।

হৃৎস্পন্দন ও নিশ্বাসপ্রশ্বাস এই দুটির কাজ নিয়মমতো চলা জন্তুদের পক্ষে এতই প্রয়োজনীয় যে, আমরা এই দু-রকম কার্য-প্রণালীকে জীবনেরই লক্ষণ ব'লে ধরে নিয়েছি। মানুষ বেঁচে আছে কি মরে গেছে জানতে গেলে প্রথমেই নাড়ী টিপে বা বুকে হাত দিয়ে দেখি এই দুটি কাজ চলছে কি না। কথায় বলে—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

রক্তপ্রবাহ

রক্তের সঙ্গে আমাদের সকলেরই যথেষ্ট পরিচয়; কিন্তু জন্তুদের শরীরে কেন এত রক্ত থাকে, তার কী কাজ, সে-বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা সকলের না থাকতেও পারে। রক্তের যে প্রয়োজন আছে, রক্ত না থাকলে কোনো জন্তু যে বাঁচতে পারে না তাও আমরা বুঝি। ম্যালেরিয়া রোগ ধরলে তার জীবাণু রোগীর রক্ত খেয়ে

ফেলে, রোগী ক্রমশ দুর্বল হোতে থাকে। তখন কুইনিন ওষুধ দিয়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণুকে মারবার চেষ্টা করতে হয় রোগীকে বাঁচাবার জন্য। জন্তুর শরীরে রক্ত থাকলেই কেবল হয় না, সব সময়েই তার প্রবাহ থাকা চাই। রক্তের প্রবাহ বন্ধ হোলেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে।

শরীরের মধ্যে রক্তপ্রবাহকে চালিয়ে রাখবার জন্য অনেকগুলি যন্ত্র আছে। ফুসফুস, হৃদয়, যকৃৎ, কিডনী প্রভৃতি দেহের ভিতরের প্রায় সব যন্ত্রগুলিকেই এই কাজে সাহায্য করতে হয়। এই যন্ত্রগুলি নিয়ে যেন একটা মস্ত কারখানা দেহের মধ্যে চলছে, কোথাও রক্ত পরিষ্কার হচ্ছে, কোথাও পাম্প হচ্ছে, কোনো যন্ত্র তার ময়লা টেনে নিয়ে শরীর থেকে বের করে দিচ্ছে, কোনোটা তার খাদ্য জোগান দিচ্ছে, ইত্যাদি। সকলেই ব্যস্ত এই সঞ্জীবনী শক্তিধারা শরীরের সর্বাংশে অবিকৃত-ভাবে যাতে প্রবাহিত হয়।



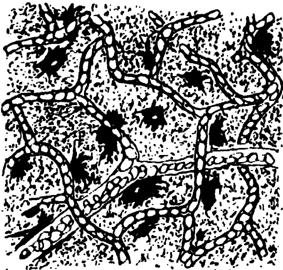
১৩. রক্তের শ্বেত কণিকা



১৪. লাল রক্তকণিকা

রক্ত যে লাল কালির মতো রঙিন পদার্থ এটা মনে করলে চলবে না। এর তরল অংশ প্রায় জলেরই মতো, বিশেষ কোনো রঙ নেই। সেই বর্ণহীন জলীয় অংশে ভাসছে অসংখ্য

রক্তকণিকা তার কতকগুলি সাদা, বেশির ভাগই লাল রঙের। এই দ্বিতীয় প্রকারের সেলগুলির রং থেকেই রক্ত লাল দেখায়। লাল রক্তকণিকা (red corpuscles) দেখতে গোল গোল চাকির মতো, তা'রা এত ছোটো যে তাদের ৩৫০০ এক লাইনে সাজিয়ে রাখলে মাত্র এক ইঞ্চি জায়গা জোড়ে। সাদা রক্তকণিকাগুলি (leucocytes) আর একটু বড়ো। অণুবীক্ষণের সাহায্যে রক্তকণিকা অনায়াসে গোনা যায়। এক বিন্দু (এক cubic millimeter) রক্তে প্রায় দশ হাজার সাদা ও পঞ্চাশ লক্ষ লাল কণিকা থাকে। এত অসংখ্য পরিমাণে লাল রক্তকণিকা থাকাতেই রক্তের রং অত লাল।



১৫. রক্তপ্রবাহ
ধমনীর নালি-উপনালির মধ্যে রক্ত-কণিকার সারি দ্রষ্টব্য

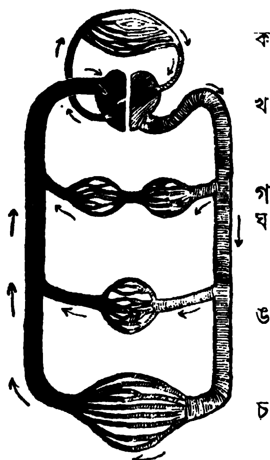
শরীরের মধ্যে রক্তের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেক সেলের কাছে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের পরিত্যক্ত অপ্রয়োজনীয় অংশ নিষ্কাশন করা। লাল রক্তকণিকা বিশেষভাবে এই কাজে ব্রতী। সেগুলি পাকস্থলী থেকে খাদ্যরস যেমন বহন করে আনে, সেই সঙ্গে ফুসফুস থেকে অক্সিজেনও সঞ্চয় করে আনতে পারে। লাল রক্তকণিকার প্রোটোপ্ল্যাজমের ভিতর হেমোগ্লোবিন (haemo-

globin) নামে এক রকম লাল রং ভরা থাকে। পূর্বেই বলেছি হেমোগ্লোবিনের হাওয়া থেকে অক্সিজেন নেবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। শ্বাসের সঙ্গে যখন ফুসফুসে হাওয়া ঢোকে সেই সময় রক্তের লাল সেলগুলি অক্সিজেন সঞ্চয় করে এবং প্রবাহকালে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সেই অক্সিজেন জোগায়। তারা যে CO_2 ত্যাগ করে রক্তের লাল কণিকাগুলিই আবার তা বহন করে এনে ফুসফুসের ভিতর ছেড়ে দেয়। ফুসফুস নিশ্বাসের সঙ্গে সেই গ্যাস বাইরে বের করে দেয়।

সাদা রক্তকণিকার সম্পূর্ণ অন্য রকম কাজ। তারা পাহারাওয়ালার কাজ করে, শরীরের মধ্যে কোনো শত্রু ঢুকলেই তাদের আক্রমণ ক'রে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে। ঘরে বাইরে মানুষের নানান শত্রু তো আছেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভীতিকর হোলো অদৃশ্য শত্রু। হাওয়াতে, জলে, মাটিতে, খাদ্যদ্রব্যে আশেপাশে সর্বত্র অসংখ্য রোগবাহী ব্যাকৃটিরিয়া রয়েছে। এদের দুটি-একটিও আমাদের শরীরে বাসা বাঁধলে যথেষ্ট অনিষ্ট করতে পারে। কোনো কাটা ঘা বা নাক, মুখ, চোখ, ফুসফুস প্রভৃতির পাতলা আবরণের ভিতর দিয়ে যখনি এদের কেউ রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে তৎক্ষণাৎ সেই অঞ্চলের সাদা রক্তকোষ চারদিক থেকে ছুটে এসে এদের মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। সব সময় এই যুদ্ধে সাদা রক্তকণিকাগুলির জিত হয় না, এরা হার মানলেই আমাদের বিপদ; কলেরা, বসন্ত, নিউমোনিয়া, ধনুষ্টংকার প্রভৃতি ব্যাকটিরিয়া-জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। এই সব শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা

করবার জন্য সাদা রক্তকোষ অহরহ সজাগভাবে পাহারার কাজ করে; দক্ষ সেনার মতো লড়াই করতে তারা সর্বদাই অভ্যস্ত।

শরীরে রক্তের কাজ ঠিকমতো চলতে থাকে যদি সর্বদা নদীর জলের মতো তার প্রবাহ থাকে। প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ভিতর স্রোত যাতে বয়ে যেতে পারে তার জন্যে দু-রকম নালি আছে; আর রক্তের স্রোত বহমান রাখবার জন্য এই দুই শ্রেণীর নালি যোগ ক'রে মাঝখানে রয়েছে হৃদ্‌যন্ত্র। অঙ্গার গ্যাস এবং পরিত্যক্ত অন্যান্য দ্রব্য বহন করে এনে শিরাগুলি হৃদ্‌যন্ত্রে ময়লা রক্ত ঢুকিয়ে দেয়। হৃদ্‌যন্ত্রের গড়ন একটি ডবল (double-acting) পাম্পের মতো। সব সময়ই সে ধুকধুক করে ও একদিকে শিরা থেকে ময়লা রক্ত টেনে নেয়, অন্য দিক থেকে ভালো রক্ত ধমনীর মধ্যে ঠেলে পাঠিয়ে দেয়। চলাচলের পথে সে দু-বার হৃদয়ে ঢোকে। শিরার ময়লা রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রের দক্ষিণার্ধের নিকটবর্তী ফুসফুসে যায়



১৬. শরীরে রক্ত-চলাচলের প্রণালী

ক. ফুসফুস খ. হৃদয়
গ. যকৃৎ ঘ. অন্ত্রনালি
ঙ. কিডনী চ. মাংসপেশী

সংস্কারের জন্য। অক্সিজেনে পূর্ণ হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই আবার সেই রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রের বামার্ধে ফিরে আসে। হৃদয় তখন এই অক্সিজেন-পরিপুষ্ট রক্ত ধমনীর ভিতর দিয়ে শরীরের সীমান্ত অবধি ঠেলে পাঠিয়ে দেয়।

হৃদয় এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হোলে চলে না. তাকে অহরহ পাম্প করতে হচ্ছে রক্তের প্রবাহ বজায় রাখবার জন্য। সে কী রকম জোরে পাম্প করে তার প্রমাণ পাই যখন কাটা ঘা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে দেখি। তার জোর কম বেশি হচ্ছে কিনা মাপতে পারা যায় হাতের নাড়ী টিপে দেখে। সুস্থ দেহে হৃদ্‌যন্ত্র মিনিটে প্রায় পঁচাত্তর বার ধুকধুক করে। শরীরের কোনো পরিবর্তন হোলেই হৃৎস্পন্দনেরও ব্যতিক্রম হয়। নাড়ী দেখে সেইজন্য ডাক্তার ও কবিরাজেরা ঠিক ধরতে পারেন শরীরের তখনকার অবস্থা কী রকম।

'খাওয়া দরকার শরীরের পুষ্টির জন্য'—এ রকম কথা প্রায়ই আমরা বলে থাকি, কিন্তু পুষ্টি বলতে কী বোঝায় কেউ যদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে তবে মুশকিলে পড়তে হয়। খাদ্যের দ্বারা শরীরের কী কী প্রয়োজন সাধন হয় জানলে তবেই পুষ্টির সঠিক অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

(১) খাবার জিনিস থেকে শরীরের সেল শক্তি আহরণ

করে। শক্তির প্রয়োজন হয় দুটি কারণে : কাজ করার জন্য এবং শরীর সবসময় সমভাবে গরম রাখার জন্য।

(২) খাবার দরকার বৃদ্ধির জন্য। শরীরের কোনো অংশ বাড়তে গেলে সেখানকার সেলের সংখ্যা বাড়াতে হয়। একটা থেকে দুটো সেল হোলেই নতুন সেলটির জন্য অতিরিক্ত খোরাক দরকার। যে-যে পদার্থে সেল তৈরী সেই সব পদার্থই মাপমতো জোগান দেওয়া চাই। সেইজন্য বাড়তি বয়সে বেশি খেতে হয়, বুড়ো বয়সে কম খেলেও চলে।

(৩) খাওয়া দরকার শরীরের নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষয়পূরণের জন্য। আমাদের শরীরে সেলের কিছু কিছু ক্ষয় সব সময়েই হয়। যে-সেলগুলি মরে যায় তাদের জায়গায় নূতন সেল তৈরী করতে হয়। তা ছাড়া শরীরচালনার কাজে দেহবস্তুরও ক্ষয় হয় যথেষ্ট। অপঘটনের ফলে শরীর যে-সব বস্তু ঘাম, প্রস্রাব প্রভৃতির ভিতর দিয়ে প্রতিনিয়ত পরিত্যাগ করে তাও পূরণ করা দরকার।

যে-প্রয়োজনগুলির কথা উপরে বলা গেল, সেই প্রয়োজন-সাধন যে-সব আহার্যবস্তুর দ্বারা হয় তারাই শরীরকে পুষ্টি দিতে পারে।

আহার্যবস্তু ছাড়াও আর-একটি জিনিস দরকার—জল। আমাদের শরীর যে-উপাদান দিয়ে গঠিত তার অর্ধেকের বেশি হচ্ছে জল। গায়ের চামড়া ও ফুসফুস দিয়ে এবং প্রস্রাবাকারে ক্রমাগত জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষতিপূরণের জন্য মানুষকে দিনে অন্ততপক্ষে দু-সের জল খেতে হয়। এই ক্ষতিপূরণ ছাড়া শরীরের পুষ্টির কাজেও খানিকটা জল লাগে।

শরীরের পোষ্টাইয়ের জন্য যে সব জিনিস পেতে হয় মোটামুটি তিন শ্রেণীতে তা ভাগ করা যেতে পারে :—

১ কার্বোহাইড্রেট—শ্বেতসার।

২ ফ্যাট—স্নেহপদার্থ।

৩ প্রোটিন—যে-খাদ্যবস্তুতে নাইট্রোজেন আছে।

ভাত, আলু, এরারুট, বার্লি, চিনি প্রভৃতি খাবারগুলি কার্বোহাইড্রেট শ্রেণীতে পড়ে। ঘি, তেল, চর্বি প্রভৃতি স্নেহপদার্থমাত্রই ফ্যাট শ্রেণীভুক্ত। এই দুই শ্রেণীর পদার্থই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরী। কার্বন ও হাইড্রোজেন থাকাতে এরা অক্সিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে শরীরে উত্তাপ জোগায়। বায়ু থেকে সেই অক্সিজেন আমরা শ্বাসনালির দ্বারা গ্রহণ করি। এই দুটি খাদ্যবস্তু আমাদের শরীরে ইন্ধনের কাজ করে এবং শরীর গরম রাখার সাহায্য করে।

তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্য এদের থেকে একটু তফাত। তাদের ভিতর কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তো আছেই কিন্তু তার সঙ্গে শরীরের খুব প্রয়োজনীয় আর-একটি জিনিস—নাইট্রোজেন আছে। প্রোটিন প্রধানত C (কার্বন), O (অক্সিজেন), H (হাইড্রোজেন) ও N (নাইট্রোজেন) এই চারটে সামগ্রী দিয়ে তৈরী, কিন্তু এ ছাড়াও তার ভিতর অল্পবিস্তর থাকে আয়রন, ফসফরাস ও সালফার—তিনটি ধাতব পদার্থ। প্রোটিনের গঠন অত্যন্ত জটিল। সব রকম আমিষ খাদ্যে প্রোটিন আছে প্রচুর পরিমাণে, ডিমের সাদা অংশ নিছক প্রোটিন। নিরামিষের মধ্যে

মুগ, ছোলা প্রভৃতি ডাল, বরবটি, সীম, কড়াইশুটি এই সব খাদ্যে প্রোটিন পাওয়া যায়। প্রোটিনকেও পোড়ানো যায়, কিন্তু শরীরের মধ্যে প্রোটিনের প্রধান কাজ হচ্ছে সেলের সারপদার্থ সরবরাহ করা। সেলের প্রোটোপ্ল্যাজম জিনিসটা বেশির ভাগই প্রোটিন, কাজেই আমাদের প্রোটিন না খেলে চলে না।

আমরা ঘি তেল প্রভৃতি যে স্নেহপদার্থ খাই সেগুলি পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যে জারকরসঘটিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে গ্লিসেরিণ (glycerine) ও কতকগুলি এসিডে (fatty acids) পরিণত হয়। রক্তপ্রবাহ এইগুলিকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নিয়ে গেলে সেখানে পুনরায় নূতন করে ফ্যাটে পরিবর্তিত হয়।

প্রোটিন বস্তুগুলিরও পেটের ভিতর গিয়ে নানান পরিবর্তন হোতে থাকে। এই অপঘটন প্রণালীর শেষ ফল হচ্ছে অ্যামিনো-এসিড (amino acid)। যে কোনো প্রোটিন বস্তুই খাই না কেন তাদের জটিল রাসায়নিক যৌগিক গঠন ভাঙতে ভাঙতে পরিণামে কয়েক রকম এমিনো এসিডে গিয়ে দাঁড়ায়। এদের রাসায়নিক গঠন তেমন জটিল নয়—রক্তের মধ্যে সহজেই প্রবেশ করতে পারে এবং আমাদের দেহ গঠন বা মেরামত করার কাজে এরাই সাহায্য করে।

জল ও এই তিন শ্রেণীর খাবার ছাড়াও শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আরো কয়েকটি জিনিসের দরকার আছে। অল্প পরিমাণে হোলেও সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনিসিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থ শরীরে প্রবেশ করা চাই। জল এবং সাধারণ খাবারে এই

সব জিনিস যেটুকু থাকে তাতেই আমাদের চলে যায়। তবে বিশেষ কারণে এর মধ্যে কোনো একটি ধাতুর অভাবের দরুন স্বাস্থ্যহানি হোলে চিকিৎসকেরা অনেক সময়ে ওষুধ হিসাবে বেশি করে সেটা খেতে দেন। তখন আমরা এই ধাতব জিনিসগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

আর-এক শ্রেণীর খাদ্য—ভিটামিন—সম্বন্ধে কয়েক বছর থেকে বিজ্ঞানী মহলে খুব আলোচনা ও অনুসন্ধান চলছে দেখা যায়। আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য ভিটামিনের যে বিশেষ প্রয়োজন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই কিন্তু এদের কী ধরনের রাসায়নিক গঠন তা এখনো ঠিক জানা যায়নি। শরীরে এদের কী কাজ তাও সঠিক বলা যায় না—তবে দেখা গেছে ভিটামিনের অভাবে স্বাস্থ্যের নানারকম অঘটন ঘটে। ভিটামিন না হোলেও চলে না, অথচ দরকার যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে। সেটুকু পাঁচমেশালি খাবার থেকেই যথেষ্ট পেতে পারি, সাধারণত পেয়েও থাকি তাই।

শরীরের প্রয়োজনের দিক থেকে যদিও খাদ্যবস্তু প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করে দেখানো হয়েছে, খাবার সময় আমরা কিন্তু সব রকম মিলিয়েই খেয়ে থাকি। খাবার হজম করা ও শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে পুষ্টি সঞ্চার করার জন্য যে-সব যন্ত্র রয়েছে তাদের কাজ হচ্ছে এই নানাবিধ জটিল খাদ্যবস্তু বিশ্লেষণ করে এমন সাদাসিধে প্রকরণে আনা যা শরীরের সেল সহজেই গ্রহণ করতে পারে এবং নিজের প্রয়োজনমতো বস্তু সেইগুলি থেকে গড়ে নিতে পারে।

এই ভাঙার কাজ চিবোনোর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়। শ্বেত-সারের অণুগুলি ভাঙতে লালার সাহায্য লাগে। লালার ভিতর এমন একটি জারক পদার্থ আছে যা দ্রব্যগুণবর্জিত শ্বেতসারের পরমাণুগুলিকে ভেঙে দ্রব্যগুণান্বিত চিনি করে ফেলতে পারে। ভাত বা আলু যতই কেন চিবিয়ে সূক্ষ্ম করে ফেলি তার কণাগুলি ভাত বা আলু আকারে আমাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে তার সঙ্গে গুলে যেতে পারে না, কিন্তু চিনি (বিশেষত গ্লুকোজ চিনি) সহজেই যায়। সব শ্বেতসারই গ্লুকোজ (glucose) আকারে রক্তে গিয়ে পৌঁছায়। মুখের ভিতর খাবার চিবোনো দরকার দুটি কারণে। প্রথমত, দু-পাটি দাঁত খাবারের শক্ত দানাগুলি ভেঙে লালার সঙ্গে মিশিয়ে নরম এবং হড়হড়ে করে দেয় তাতে খাদ্যবস্তু সহজেই গলনালি দিয়ে পেটের ভিতর নেমে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত খাবারের মধ্যে যে অংশ শ্বেতসার তার সঙ্গে লালার ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রণে চিনিতে পরিণত করবার যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া তা ভালো ক'রে হোতে পারে। গ্লুকোজ আকারে যে চিনি রক্ত গ্রহণ করতে পারে মুখের ভিতর কেবল লালার সাহায্যে সে-চিনি তৈরি হয় না; লালা কেবল প্রথম ধাপ এগিয়ে দেয়, রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় পেটের ভিতর গিয়ে। মুখ থেকে খাবার যখন পেটের মধ্যে গিয়ে পড়ে তখন সেখানে হজমী রস প্রধানত হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড় (hydrochloric acid) তৈরি হয়ে জমে আছে—লালা খাবারের যে অংশগুলিকে ভাঙতে পারেনি এই তীব্র এসিড সেই সব খণ্ডগুলি নিয়ে তাদের ভেঙেচুরে ফেলতে শুরু

করে। ভাত, আলু প্রভৃতি শ্বেতসার খাদ্যের যে-অণুগুলি চিনি হবার অর্ধেক পথ এগিয়েছে সেগুলিকে পুরোপুরি গ্লুকোজে পরিণত করতে তখন দেরি হয় না। পেটের ভিতর গিয়ে এসিডের সংস্পর্শে প্রোটিনের দানাগুলিরও নানারকম পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কেবল হাইড্রোক্লোরিক এসিড এই কাজ করতে সমর্থ নয় তাই তার সঙ্গে অন্য পাঁচ রকম জারক পদার্থও মিশ্রিত থাকে।

মুখ থেকে আরম্ভ করে পৌষ্টিকনালির প্রত্যেক অংশেই (পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি) নানারকম জারক রস নির্গত হয়ে খাবারের সঙ্গে মেশে। অনেকগুলি enzyme দিয়ে জারকরস প্রস্তুত। এদের কাজ হচ্ছে খাবারের বিভিন্ন অংশ নিয়ে তাদের পরমাণুর জটিল কায়িক গঠন ভেঙে সহজ করে দেওয়া। যে-প্রণালীতে এই ভাঙা-চোরার কাজ হয় তা বর্ণনা করতে গেলে রসায়ন বিদ্যার সাহায্য নিতে হবে। তাতেও কুলোবে না, কেননা এখনো আমরা সমস্ত ঘটনা পুরোপুরি জানি না। এইটুকু আমাদের জানলেই আপাতত চলবে যে খুব সামান্য একটুখানি এনজাইম অনেকখানি রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটাতে পারে, কিন্তু এনজাইমের নিজের কোনো পরিবর্তন হয় না। তা ছাড়া জানা গেছে প্রত্যেক এন-জাইমের এক-একটি নির্দিষ্ট কাজ থাকে। লালার 'টায়ালিন' এনজাইম শ্বেতসারের কণাকে গ্লুকোজ করার একটি ধাপ এগিয়ে দিতে পারে মাত্র। তখন অন্য কোনো একটি এনজাইম আর-এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। এইজন্য হজম-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে অনেকগুলি এনজাইমের দরকার। প্রোটিনের পরমাণু সাধারণত

খুব জটিল বলা হয়েছে পূর্বে। একে ধাপে ধাপে ভেঙে সহজ পদার্থে পরিণত করতে অনেক পরিশ্রম ও পেঁপসিন প্রমুখ অনেক এনজাইমের প্রয়োজন। প্রোটিন হজমের ব্যাপারে এনজাইমের কাজের শেষ পরিণতি হচ্ছে অ্যামিনো-এসিড (amino acid)। প্রোটিন-বস্তুর এটি খুব সহজ মৌলিক অবস্থা—এই অবস্থায় অন্ত্রনালির গা দিয়ে অনায়াসে তা রক্তের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। ডিম, মাছ বা মাংস প্রভৃতি আমিষ খাদ্যদ্রব্যে যে প্রোটিন আছে তাকে অ্যামিনো-এসিডে পরিণত করা সহজ কিন্তু নিরামিষ প্রোটিনের গঠন বেশি জটিল, সেইজন্য তা হজম করা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কঠিন।

বাইরে থেকে নানারকম খাদ্যবস্তু নিয়ে পুষ্টির উদ্দেশে তাকে ভেঙেচুরে রক্তের ভিতর গ্রহণোপযুক্ত করে তোলার জন্য আমাদের শরীরে যে যন্ত্রশ্রেণী আছে তার সাধারণ নাম পৌষ্টিকনালি। তার স্থানে স্থানে নানান যন্ত্র অবস্থিত থাকলেও মুখ থেকে আরম্ভ করে মলদ্বার পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক নালি চলে গেছে—তাই এই যন্ত্রপ্রণালীর নামে নালি কথাটার ব্যবহার ন্যায়-সংগত। পৌষ্টিকনালির অংশ বিশেষে কোথাও সরু, কোথাও মোটা, কোথাও থলের মতো কিন্তু নালির ধারাবাহিকতা কোথাও নষ্ট হয়নি। মুখের গহ্বর থেকে পেট পর্যন্ত খাবার নামে যে-গলনালির ভিতর দিয়ে সেটা এক ফুটের কিছু কম লম্বা হবে। ঢোক গেলবার সময় যেই কোনো বস্তু এর ভিতর ঢুকে পড়ে তখন তার গায়ে জড়ানো পেশীর এমন ধরাবাহিক ভাবে সংকোচন ও প্রসারণ ক্রিয়

হোতে থাকে যে সেই বস্তুকে ঠেলে ঠেলে পেটের দিকে নামিয়ে নিয়ে যায়। শরীরের ভিতরে যে-সব যন্ত্র আছে তাদের অনেকেরই এইরকম স্বাধীন ভাবে ছান্দিক গতি আছে। রক্ত-প্রবাহ, হৃৎকম্পন, পাকস্থলী ও অন্ত্রনালির সংকোচন প্রসারণ প্রভৃতি দেহক্রিয়াগুলি চলে মাংসপেশীর ছান্দিক গতির সাহায্যে। গলনালি বা অন্ত্রনালির ভিতর দিয়ে খাদ্যবস্তু দফায় দফায় ঠেলা মেরে যে-ভাবে এগোয় যেন শুঁয়োপোকার চলার মতো।

পাকস্থলী, সাধারণ কথায় যাকে আমরা পেট বলি, একটা ছোটো থলে—তার ভিতর প্রায় দু-সের তরল জিনিস ধরতে পারে। এর দু-দিকে দুটো মুখ—উপরের মুখ দিয়ে গলনালি থেকে খাবার নেমে এসে তার ভিতরে ঢোকে ও নিচের দিকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় অন্ত্রনালিতে। অন্তত ঘণ্টাখানেক লাগে পেটের ভিতর খাবার পাক হোতে। এসিড এবং অন্যান্য জারক রসের সঙ্গে যাতে ভালো ক'রে সংমিশ্রণ হয় পেটের ভিতর খাবারগুলিকে নিয়ে এই সময়ের মধ্যে নানারকম নাড়াচাড়া চলতে থাকে। পাকস্থলী ভিস্তির মশকের মতো অসাড় একটি থলি নয়—তারও সংকোচন-প্রসারণের ক্ষমতা আছে। খাবার জিনিস কিছু ভিতরে গিয়ে পড়লেই পাকস্থলীর পেশীগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাদের ছান্দিক সংকোচন-প্রসারণের ফলে খাবারের দলাগুলি ওলটপালট খেয়ে ভালো ক'রে জারকদ্রব্যের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়। এতে রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্য করে; ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়। ঘি তেল প্রভৃতি

তৈলাক্ত বস্তু ছাড়া আর-সব জিনিসেরই কায়িক জটিলতা ভেঙে সহজ করে ফেলা হয়। স্নেহজাতীয় বস্তু হজম করা পেটেরও কাজ নয়, সে হয় পরে অন্ত্রে গিয়ে।

পেটের যেটুকু কাজ তা শেষ হোলেই খাদ্যবস্তু চলে যায় অন্ত্রনালিতে। তার আগে যেতে পারে না, কেননা পাকস্থলী থেকে অন্ত্রে বেরবার পথে একটি দরজা আছে। যতক্ষণ খাবার হজম না হয় এই দরজা বন্ধ থাকে তার পরেই খুলে যায়।

অন্ত্রনালিকে আমাদের দেহ থেকে বের করে যদি টেনে ধরা হয় তবে লম্বায় হবে ২৫ ফিট। বেশ কৌশলের সঙ্গে ভাঁজ ক'রে এতখানি লম্বা নল তলপেটের গহ্বরে অল্প জায়গার মধ্যে রাখা থাকে। এই নলের ২০ ফিট পর্যন্ত সরু—তাকে সেইজন্য ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine) বলে। শেষের দিকের ৫ ফিট মোটা, তাই সেই অংশের বৃহদন্ত্র (large intestine) নাম দেওয়া হয়েছে। বৃহদন্ত্র শেষ হয়েছে মলদ্বারে।

পাকস্থলী থেকে বেরিয়ে ইঞ্চি চারেক পরেই ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর দুটো সরু নালি ঢুকেছে শরীরের দুটো প্রধান গ্ল্যাণ্ড থেকে। এই দুটি গ্ল্যাণ্ড, যকৃৎ (liver) ও অগ্ন্যাশয় (pancreas), পরিপাক-ক্রিয়ায় প্রধান সহায়ক যন্ত্র। যকৃতের মধ্যে খুব তিতো রস সব সময়েই প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেই পিত্তরস জমা হয় ঐ নলের মুখে একটি ছোটো থলে, পিত্তাশয়ের (gall bladderএর) মধ্যে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর দিয়ে যখন খাবার চলে যেতে থাকে পিত্তাশয় থেকে পিত্তরস বেরিয়ে এসে সেই খাবারের সঙ্গে মিশে যায়। যকৃৎ থেকে

যেমন পিত্ত বেরয়, তার পাশেই অগ্ন্যাশয় থেকেও অন্যরকম রস ঐ সময় বেরিয়ে খাবারের সঙ্গে মেশে। এরা জারক রস—পাকস্থলীর ভিতর যে-সব এনজাইম খাবার হজম করায়, তার চেয়ে এদের হজমী শক্তি উগ্রতর। শরীর থেকে পাকস্থলী বাদ দিলেও খাবার হজম করা সম্ভব কিন্তু এই দুটি যন্ত্র না থাকলে চলে না। পূর্বেই বলেছি ঘি, তেল প্রভৃতি স্নেহপদার্থ যা খাই তা তেমনই প্রায় থেকে যায় পাকস্থলী পর্যন্ত। ক্ষুদ্রান্ত্রে গিয়ে পিত্তের সঙ্গে সংস্পর্শে এলে তবে তার পাক শুরু হয়। কোনো কারণে পিত্তরসের অভাব হোলে ঘি বা তেলের রান্না আমাদের পক্ষে হজম করা কঠিন।

বিশ-ফিট ব্যাপী লম্বা ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর দিয়ে খাবার চলতে থাকে দমকে দমকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশীর সংকোচন সমতালে হয় না সেইজন্য খাদ্যবস্তু সমভাবে নেমে যেতে পারে না, ফুটখানেক ধরে একই জায়গায় চাপাচাপি চলে কয়েক মিনিটের জন্য তার পর ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হয় আর-এক ফুট, সেখানে আবার চাপাচাপি চলতে থাকে। অন্ত্রের এই ধরনের সংকোচন-প্রসারণকে পেরিস্টলসিস (peristalsis) বলে। কোনো কারণে অন্ত্রের মধ্যে খাদ্যবস্তুর এইভাবে চলনের বাঁধা ছন্দ ভঙ্গ হোলেই আমাদের শূলব্যথা ধরে। খাবারের দলাগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের ২০ ফিট এগিয়ে যেতে লাগে প্রায় ৩ ঘণ্টা। চলার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রান্ত্রের গা দিয়ে খাবারের পোষ্টাই অংশ রক্ত গ্রহণ করতে থাকে। পড়ে থাকে অপাচ্য অংশ যা শরীর থেকে শেষে বেরিয়ে যায় মল আকারে।

খাবার হজমের ব্যাপার খুব সোজা নয় দেখা যাচ্ছে। তার আরম্ভ মুখ থেকে, শেষ হয় বৃহদন্ত্রে গিয়ে। তার মধ্যে কত রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া। রীতিমতো একটা রাসায়নিক ল্যাবরেটরি। কিন্তু এত কলকারখানার ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমাদের হজম খুব সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শরীরের অন্য অনেক যন্ত্রের মতো জন্তুজানোয়ারের পাকযন্ত্র অত কার্যকরী নয়। যা খাওয়া যায় তার পোষ্টাই অংশ সম্পূর্ণভাবে রক্ত গ্রহণ করতে পারে না, পরিত্যক্ত মলের মধ্যে কিছু তবু থেকে যায়। বিশেষত উদ্ভিজ্জভোজী জন্তুদের মলের মধ্যে অনেকখানি পুষ্টিকর দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তাই গোরুর সার মাটির উর্বরাশক্তি বাড়াবার জন্য আমাদের এত কাজে লাগে।

ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে বেরিয়ে মল (তখন আর তাকে খাবার বলা যায় না—খাবারের পোষ্টাই অংশ ততক্ষণে রক্তের ভিতর চলে গেছে) গিয়ে পড়ে বৃহদন্ত্রে। অন্ত্রের এই মোটা নালি প্রথমে ডান দিক দিয়ে উপরে ওঠে, তার পর পাকস্থলীর নিচে দিয়ে বাঁয়ে মোড় ফিরে নিচের দিকে মলদ্বারে নেমে যায়। এটা দেখতে যেন জাহাজ-বাঁধা রশার মতো, গায়ে ঢেউখেলানো পাক। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রের সন্ধিস্থলে অ্যাপেণ্ডিক্স (appendix) নামে একটি ছোট্ট আঙুলের মতো অংশ তার গা থেকে ঝুলে থাকে। এই থলেটির কী কাজ এখনো ঠিক জানা নেই—ডাক্তাররা এক সময় মনে করতেন যে কাজ তো কিছুই নেই বরং মাঝে মাঝে ফুলে উঠে মানুষের প্রাণসংশয় ঘটায় তাই সুযোগ পেলেই সেটা কেটে বের

করে দিতেন। এখন বিশেষ কারণ ছাড়া অত সহজে কাটতে চান না—কেননা এর প্রয়োজনীয়তা কিছু আছে বলেই মনে করেন। মল জমা করে রাখা ছাড়া বৃহদন্ত্রের বিশেষ কোনো কাজ নেই। সম্পূর্ণ কেটে বাদ দিলেও মানুষ স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারে পূর্বে ধারণা ছিল তবে এখন জানা গেছে অল্পস্বল্প হজমের কাজ এখানেও চলে। বিশেষত ব্যাকটিরিয়ার কাজ বেশির ভাগ এখানেই হয়। হজমের কাজে অন্ত্রনালিতে অবস্থিত ব্যাকটিরিয়া যথেষ্ট সাহায্য করে। তা ছাড়া এই জায়গা থেকে রক্ত টেনে নেয় তার প্রয়োজন মতো জল—তাই ক্ষুদ্রান্ত্রের তরল খাদ্যসামগ্রী বৃহদন্ত্রে অগ্রসর হোতে হোতে ক্রমশ কঠিন হয়ে মলে পরিণত হয়।

বৃহদন্ত্রের ভিতর দিয়ে মল বেশ ধীরগতিতে অগ্রসর হয়, ৫ ফিট যেতে লাগে প্রায় ১২ ঘণ্টা। এর মধ্যে নানারকম ব্যাকটিরিয়া জন্মাবার সুযোগ পায়। এখানে নাড়াচাড়া তেমন নেই, জায়গাটা বেশ গরম, প্রচুর খাবার, ব্যাকটিরিয়াদের ভারি সুবিধা। এইজন্য মলের মধ্যে আমাদের পরিত্যক্ত খাদ্যবস্তু অপেক্ষা মরা ব্যাকৃটিরিয়ার ভাগ বেশি। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে এই সব ব্যাকটিরিয়া অনেক সময় রক্তের মধ্যে ঢুকে আমাদের ব্যামো বাধিয়ে দেয়। খাওয়ার অত্যাচার না করা, প্রতিদিন সময় মতো মলত্যাগ করা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ দরকার। খোঁজ করলে দেখা যায় মানুষের অধিকাংশ অসুস্থতার মূল কারণ—পাকযন্ত্রের বিকার।

আবর্জনা ত্যাগ

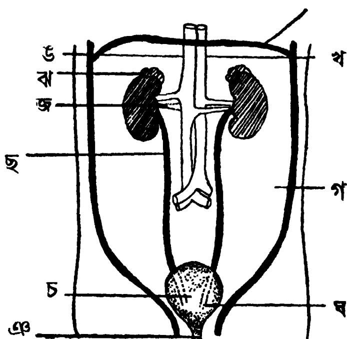
আমরা প্রত্যহ যে স্থূল পদার্থ খাই বা জলীয় বস্তু পান করি তার সমস্তটা শরীরের কাজে লাগে না, আংশিকভাবে গ্রহণ করি মাত্র আগে বলা হয়েছে। বাকি অংশ কী হয়, কোথায় যায়।

মল ছাড়াও আরো যে-সব অনাবশ্যক পদার্থ বের ক'রে দেওয়া হয় (আপনা থেকে কিছু বেরয় না মনে রাখতে হবে, বের করে দিতে শরীরকে চেষ্টা করতে হয় ও তার জন্য কল কৌশল লাগে)—তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে CO_2 গ্যাস, জল, ও নুন ইউরিয়া (Urea)। এইগুলি ধরে রাখলে অল্পক্ষণেই শরীর বিষিয়ে ওঠে। গন্ধক, ফসফরাস প্রভৃতি কয়েকটা ধাতব বস্তু আছে যেগুলি শরীরে জমলে ততটা ক্ষতি করে না, কিন্তু এগুলিকেও বের করে দেওয়া দরকার। বেশি জমতে দিলে এগুলিও শরীরে বিষের কাজ করতে পারে।

CO_2 বাষ্পীয় বলে এর নিঃসরণের কাজ ফুসফুস করে। অন্যগুলি জলীয় বা জলে গুলে যায় তাই এরা বেরয় প্রস্রাবের সঙ্গে। বৃক্ক বা কিডনী ও লিভার এগুলিকে শরীর থেকে বের করে দেবার কাজে সাহায্য করে। অন্ত্রের গা থেকে পুষ্টিকর সামগ্রী রক্তপ্রবাহে চলে গিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে যায়। পুষ্টির কাজ হয়ে গেলে অপঘটনের ফলে রক্তের মধ্যে CO_2 গ্যাস জমে ওঠে। এই দূষিত রক্ত তখন ফুসফুসে

ফিরে গিয়ে সেখানকার হাওয়ায় CO_2 গ্যাস ছেড়ে দেয়। নিশ্বাসের সঙ্গে তখন এই অপকারক গ্যাস বাইরে বেরিয়ে আসে।

CO_2 বের করে দেবার জন্য রক্তকে ছুটতে হয় ফুসফুসে, অন্যান্য আবর্জনা ত্যাগ করার জন্য তাকে যেতে হয় কিডনী ও যকৃতে। যকৃতের অনেকগুলি কাজের মধ্যে রক্তশোধন একটি প্রধান কাজ। রক্তের সঙ্গে যে-সব আবর্জনা-বস্তু লিভারে আসে তার মধ্যে অ্যামোনিয়া (ammonia) প্রধান। অ্যামোনিয়া প্রোটিন অপঘটনের ফলে প্রস্তুত হয় ও এই বস্তুটি শরীরের বিশেষ ক্ষতিকর।

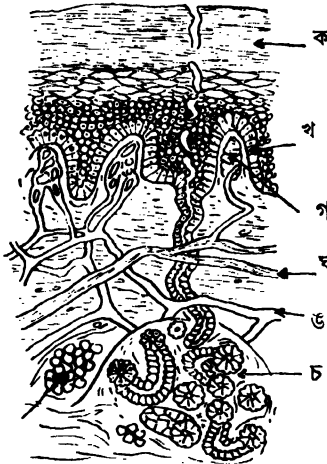


১৭. শরীরের আবর্জনা নিষ্কাশনের কয়েকটি যন্ত্র

ক. ডায়াফ্রাম খ. ধমনী
গ. পেটের গহ্বর ঘ. মূত্রনালির মুখ
ঙ. শিরা চ. মূত্রথলি
ছ. মূত্রনালি জ. কিডনী
ঝ. সুপ্রারিনাল গ্ল্যাণ্ড ঞ. ইউরেথ্রা

বেশিক্ষণ বা বেশি মাত্রায় অ্যামোনিয়া রক্তের মধ্যে থাকলে বিষের মতো কাজ করে। যকৃৎ অ্যামোনিয়ার বিষ মেরে দেয়। তার এমন একটু পরিবর্তন করে দেয় যে তখনকার মতো তা শরীরের ক্ষতি করতে পারে না। সেই অবস্থায়

কিডনীর মধ্যে নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারে। কিডনী দুটি যকৃৎ-ফেরত সমস্ত আবর্জনা নিয়ে নেয় এবং সেগুলির আরো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে বের ক'রে দেবার ব্যবস্থা করে। পেটের গহ্বরে দু-দিকে দুটো কিডনী,—তার থেকে দুটো নল নেমে আসে মূত্রথলি (bladder) ব'লে একটা থলেতে। কিডনীতে প্রস্রাব তৈরি হয়ে অষ্টপ্রহর ক্ষীণ ধারায় নল বেয়ে এই থলির মধ্যে জমতে থাকে— সেটা ভরতি হোলেই আমাদের প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা হয়।



১৮. ত্বকের গঠন

ক. মরা সেল খ. জীবন্ত সেল
গ. স্পর্শ অনুভবকারী নার্ভের শেষাংশ
ঘ. নার্ভের শাখাবিশাখা ঙ. রক্ত চলাচলের নালি চ. ঘামের গ্ল্যাণ্ড

সুস্থ অবস্থায় প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টায় মানুষ সাধারণতঃ প্রায় ১½ সের প্রস্রাব ত্যাগ করে। এই ১½ সের প্রস্রাবের ভিতর জল ছাড়া ৪৫০ গ্রেন ইউরিয়া, ২২৫ গ্রেন নুন ও ১৫০ গ্রেন অন্যান্য দ্রব্য থাকে। বাকি ৯৬% জল। শরীর থেকে এতখানি জল যদি ক্রমা-

গত বেরিয়ে যায় অন্তত ততখানি জল খেয়ে আমাদের সেটা পূরণ করা নিশ্চয় দরকার। প্রস্রাব ছাড়া জল-নিকাশের অন্য পথও আছে। ফুসফুস দিয়ে নিশ্বাসের সঙ্গে সর্বদা বাষ্প-আকারে জল বেরিয়ে যায়। নাকের সামনে কাঁচের টুকরা ধরলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সমস্ত শরীর দিয়েও জলনিকাশ হয়, চামড়ার গায়ে ছোটো ছোটো অসংখ্য ছিদ্র আছে—সেগুলিকে চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ছিদ্রের নিচে একটা করে থলের মতো গ্ল্যাণ্ড আছে—এই গ্ল্যাণ্ড-গুলির কাজ হচ্ছে রক্ত থেকে জল শুষে নেওয়া। সেই জল চামড়ার ছিদ্রগুলি দিয়ে ঘাম হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ঘামের মধ্যেও স্বল্পপরিমাণ ইউরিয়া ও নুন থাকে—ইউরিয়া থাকার দরুন ঘামে দুর্গন্ধ। প্রস্রাব বেশি পরিমাণে ও ঘাম অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে শরীর থেকে ক্রমান্বয়ে আবর্জনা বের করে দিচ্ছে। জলের সাহায্যে সেটা করতে হচ্ছে কেননা ইউরিয়া প্রভৃতি আবর্জনা জলে সহজে গুলে যায়, গ্যাস নয় বলে CO_2 র মতো ফুসফুসের দ্বার দিয়ে তাদের নিকাশের সম্ভাবনা নেই।

প্রস্রাবের পরিমাণ বা তার ভিতর ইউরিয়া ও অন্যান্য বস্তুর পরিমাণ সব সময় ঠিক থাকে না। জল বেশি খেলে বা ঠাণ্ডা-বর্ষার দিনে প্রস্রাব বেশি হয়। পরিশ্রম বেশি করলে ইউরিয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। কেননা তখন শরীরের সেলগুলির মধ্যে সংগঠন ও অপঘটনের কাজ দ্রুত হোতে থাকে। অসুস্থ অবস্থায়

যকৃৎ ও কিডনী ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না—তাই তখন প্রস্রাব কমে আসে। প্রস্রাব বন্ধ হোলেই ডাক্তারদের দুশ্চিন্তা।

অপ্রয়োজনীয় বা পরিত্যাজ্য বস্তু অবিলম্বে বহিষ্কৃত করবার এই সব নানান উপায় ও কৌশল শরীরের মধ্যে আছে। এর মধ্যে কোনোটা যদি কিছুক্ষণ ঠিকভাবে কাজ না করে তাহলে ব্যারামের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে একটা কোনো যন্ত্র বিকল হোলে অন্যগুলি কিছুক্ষণের জন্য কাজ চালিয়ে নিতে পারে কিন্তু বরাবর তা পারে না। শরীরে দূষিত বস্তুর অত্যাধিক্য হোলে মৃত্যু ঘটতে পারে।

নার্ভমণ্ডলী

এতক্ষণ আমরা জন্তুজানোয়ারদের নড়াচড়া, নিশ্বাসপ্রশ্বাস, খাওয়াদাওয়া প্রভৃতি বাইরে থেকে সহজবোধ্য বিষয়ের আলোচনা করেছি। এখন আরো ভিতরের খবর নিতে হবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার কী কাজ, শরীর-চালনায় কার কী প্রয়োজন খণ্ডভাবে দেখেছি—কিন্তু বাকি রইল জানবার এদের কাজ দেখছে কে, এদের পরস্পরের যোগাযোগ-সাধন হচ্ছে কী করে, কী নিয়মে সমস্ত যন্ত্র চলছে, চালনার হুকুম কোথা থেকে আসছে, কে সেই হুকুম বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, হুকুম-কর্তার কাছে বহির্জগতের বার্তাই বা পৌচছে কী করে। এ-সব বিষয় বুঝতে গেলে একটু গোড়া ঘেঁষে সেলের কথা আবার পাড়তে হবে।

সেলের প্রোটোপ্ল্যাজম তার পরিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট

...জাগ। তার এই স্বভাব প্রোটোপ্ল্যাজমকে জড়বস্তুর তুলনায় ...বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। বাইরের যে-কোনো রকম সংস্পর্শে এলেই তার কিছু পরিবর্তন ঘটে, আঘাত মাত্রেরই সে প্রত্যুত্তর দিতে পারে। আঘাত যেখানেই লাগুক তার সমস্ত বস্তুপিণ্ডের ভিতর দিয়ে একটা ঢেউ চলে গিয়ে তাকে কাঁপিয়ে তোলে। আঘাতের



১৯. ত্বকের নিচে চার রকম নার্ভ-সীমান্ত

ক. ব্যথা অনুভূতির খ. ও গ. স্পর্শ অনুভূতির

ঘ. তাপ অনুভূতির

মাত্রা অতিরিক্ত হোলে প্রোটোপ্ল্যাজমের আমূল পরিবর্তন ঘটে এমন কি মৃত্যুও হোতে পারে।

বাইরে থেকে সর্বদাই নানাপ্রকারের আঘাত সেলের উপর ...র্ষিত হচ্ছে। আলো, ইলেক্‌ট্রিসিটি, উত্তাপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ

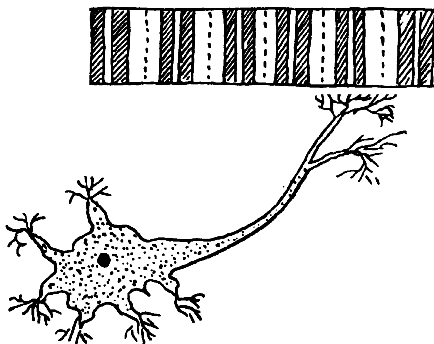
কত রকম শক্তির সঙ্গে তাকে যোঝাযুঝি করতে হয়। সব শক্তির সম্বন্ধে সব সেলের সমান অনুভূতি নয়। কোনো সেল আলোর আঘাত যেমন অনুভব করে তীব্র গন্ধ তাকে তেমন বিচলিত করে না। জন্তুদের শরীরের এক-এক অংশে এমন কতকগুলি সেল একত্র হয়েছে যাদের বিশেষ বিশেষ আঘাতে সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে। চোখের সেলগুলি আলোর রশ্মি বেশি ক'রে অনুভব করে, কানের ভিতরের সেলগুলি শব্দের আঘাতে সাড়া দেয়। এক এক বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাবান সেলের সমষ্টি নিয়ে যে-সব যন্ত্র শরীরে ছড়ানো রয়েছে তাদেরই ইন্দ্রিয় ব'লে থাকি। ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে আমাদের বাইরের জগতে পরিচয় ঘটে। আলোর জগতের পরিচয় পাই চোখের দ্বারা, শব্দ-জগতের সন্ধান আসে কানের ভিতর দিয়ে।

এই সব বিশিষ্ট সেলের কী রকম আশ্চর্য অনুভবশক্তি—দু-একটা উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হবে। মানুষের চোখ খুব উঁচু-দরের ইন্দ্রিয় নয়, অনেক জন্তু যে-আলোতে দেখতে পায়, আমরা সে-আলোতে দেখতে পাই না। তবু তার ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। ছোটো একটি পাত্রে যদি ৪৬০,০০০,০০০ মিলিগ্রামের এক-ভাগ অংশ ঘ্রেয়বস্তু থাকে তবে আমাদের নাক তা অনায়াসে টের পায়।

গাছপালা বা জন্তুজানোয়ারের অনুভবশক্তি আছে, সে না হয় মানলুম কিন্তু অনুভব করবার প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাস্য থেকে যায়। এক-এক রকম সেলের বিশেষ বিশেষ

ক্ষমতা আছে জেনেছি কিন্তু এদের অনুভূতি আমাদের জ্ঞান-গোচর কী করে হচ্ছে এবং অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত করবার কোনো ব্যবস্থা আছে কি না এই বিষয় অনুসন্ধান করে দেখা দরকার।

পূর্বে বলা হয়েছে, শরীরের প্রত্যেক সেলের সঙ্গে পাশের সেলের আঙ্গিক যোগ আছে ; যে-কোনো একটি সেলে আঘাত এসে পৌঁছলে তার ধাক্কা চলে যায় অন্য সব সেলে। এই ধাক্কা



২০. মাংসপেশীর সঙ্গে নার্ভ-সেলের যোগ

তাড়াতাড়ি বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এক জাতের সরু লম্বা সেল যাদের বিশেষ কাজই হচ্ছে টেলিগ্রাফের তারের মতো বার্তা বহন করা। এইগুলিকে নার্ভ-সেল বলে, সুতোর মতো পরস্পর গাঁথা হয়ে এরা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে জালের মতো। শরীরের যে-কোনো

জায়গায় আঘাত লাগলে তার কম্পন এরা বয়ে নিয়ে যায় সর্বত্র। বেশ দ্রুতই বহন করে, মিনিটে ৪ মাইল গতিবেগে। জাহাজ, রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি মানুষের তৈরী কলকবজাগুলি একটা রাজত্ব চালাতে যে-রকম রাজকার্যে সাহায্য করে, আমাদের শরীরে নার্ভমণ্ডলীও সেই রকম শরীরচালনার কাজে সাহায্য করে। কোটি কোটি সেল এক সূত্রে বেঁধে রাখা সম্ভব হোত না নার্ভ-সেলের সাহায্য বিনা।

পিঠের মেরুদণ্ডের ভিতর বরাবর নলের মতো গর্ত আছে। এর ভিতরটা অসংখ্য নার্ভ-সেলে ভরা। এই সেলগুলি দেখতে যেন সলতের মতো। এরা স্বতন্ত্র নয়, একটির সঙ্গে আর-একটি গাঁথা সরু তারের মতো। একগাছা ইলেকট্রিক কেবলের (cable) মধ্যে যেমন বহুসংখ্যক তার গোচ্ছা-বাঁধা, মেরুদণ্ডের ভিতরে তেমনি নার্ভ-সেলের মোটা গোচ্ছা আছে। পেটের কাছ থেকে বেরিয়ে সেই নার্ভ-গুচ্ছ মাথার মগজের মধ্যে চলে গেছে। নার্ভের তারগুলি এত সরু, দশটি মিললে তবে একগাছা চুলের মতো মোটা দেখায়। শিরদাঁড়ার নিচের দিকে এর অধিকাংশ গোচ্ছা ঢুকেছে বলেছি, তারা এসে জুটেছে সেখানে নানা অঞ্চল থেকে। শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সীমান্ত থেকে তারা টেলিফোনের তারের মতো বার্তাবহরূপে চলে আসছে এবং এক সঙ্গে তাল পাকিয়ে শিরদাঁড়ার গর্তের ভিতর দিয়ে উঠে চলে যাচ্ছে মগজের মধ্যে। সেখানে গিয়ে আবার ছড়িয়ে যায়। মগজের মধ্যে এক-একটি অংশ এক-এক রকমের বার্তা গ্রহণের

উপযোগী। পা থেকে যে নার্ভের তার এসেছে সেগুলি এক জায়গায়, পাকস্থলী থেকে যা এসেছে সেগুলি অন্য জায়গায়, এই রকম ভাগ হয়ে যথাস্থান তারা বেছে নেয়। মগজটা যেন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ (telephone exchange)—নানাদিক থেকে শরীরের সব অঞ্চল থেকে সেখানে খবর পৌঁছায়। সেই খবর পেয়েই কী করতে হবে তখুনি আবার তার থেকে হুকুম চলে যায়। এই হুকুমও নার্ভ বহন করে নিয়ে যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, তারা সেই অনুসারে কাজ করে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ডান হাতের একটা আঙুলের ডগায় আগুনের ছেঁকা লাগল। আঙুলের ডগায় যে-নার্ভগুলি চামড়ার নিচেই ছড়ানো রয়েছে তারা তখুনি সেই খবর নিয়ে গেল মেরুদণ্ডে বা মগজে। সেখান থেকে হুকুম গেল হাতের পেশীর কাছে—"হাত সরিয়ে নাও"। মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে হাতের পেশীগুলি এমন সংকুচিত হোলো যে, হাত লাফ দিয়ে আগুন থেকে সরে গেল। আগেই বলেছি নার্ভ খবর নিয়ে যেতে পারে মিনিটে চার মাইল। হাতের আঙুল থেকে মেরুদণ্ড বা মগজ পর্যন্ত মাত্র কয়েক ফিট, এইটুকু পথ যাতায়াত করতে এক সেকেণ্ডেও লাগে না। আগুনের তাপ-লাগা ও হাত-সরানোর মধ্যে সময়ের কোনো ব্যবধান আছে ব'লে আমরা ধারণা করতে পারি না কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই এত খবরাখবর হয়ে গেছে। ইন্দ্রিয় থেকে খবর বয়ে আনা এবং মগজ থেকে ইন্দ্রিয়ে খবর পৌঁছে দেওয়ার কাজ একই নার্ভ করে না তাহলে গোলমাল বেধে যাবার সম্ভাবনা, একই ধরনের কিন্তু দুই ভিন্ন প্রকৃতির নার্ভ

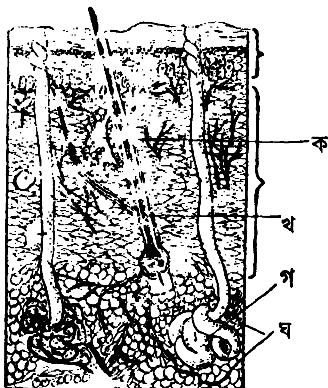
সেইজন্য আছে। এক রকম নার্ভের ভিতর দিয়ে আঘাতের ঢেউ বা কম্পন এক দিকে চলে, দ্বিতীয় প্রকারে উলটো দিকে যায়। তাদের গঠনের আর কোনো পার্থক্য নেই। এই দু-রকম নার্ভই অহরহ ব্যস্ত থাকে, অসংখ্য আঘাতের ঢেউ ইন্দ্রিয় থেকে মগজে তারা বয়ে নিয়ে যায়, মগজ তার সাড়া দিয়ে যথোচিত কর্তব্য পালনের আদেশ ফিরে পাঠায়। মানুষের গড়া কোনো টেলিফোন-প্রণালী এত বেশি কাজ করে না।

শরীরে অনেক রকম ইন্দ্রিয় আছে। নাক, কান, চোখ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়ের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় বেশি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে নার্ভ সমস্ত জায়গায় তার জাল বিস্তার ক'রে রেখেছে। শরীরের প্রত্যেক অবয়বের এমনকি প্রত্যেক সেলেরই ক্ষমতা আছে খবর পাঠিয়ে দেবার। পেটের নার্ভ খিদে পেলে বা বদহজম হোলে মগজকে খবর দেয়। এইগুলিকে আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় বলা যেতে পারে, চোখ-কান যেমন বাহ্যেন্দ্রিয়। বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি দূরের বা বাইরের খবর এনে দেয়, আর আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলি শরীরের আপন নিজস্ব খবর নার্ভকেন্দ্রে পাঠায়।

বাহ্যেন্দ্রিয়

(১) স্পর্শ। চামড়ার পর্দা দিয়ে শরীর আগাগোড়া মোড়া, এটা অসাড় আবরণ নয়, জীবন্ত সেল দিয়ে তৈরী। চামড়ার সেলগুলি ঠাণ্ডা-গরম তো অনুভব করেই, স্পর্শবোধ তাদের বিশেষত্ব। মোলায়েম স্পর্শে তারা যেমন আরাম পায় কঠিন বা উগ্র

কোনোরকম জিনিসের সংস্পর্শে তেমনি ব্যথা অনুভব করে। "অনুভব" করা বা "ব্যথা" পাওয়া কথাগুলি ঠিক এইভাবে আমাদের এক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়। বাইরের যে-কোনো বস্তু সেগুলিকে স্পর্শ করলে তারা সাড়া দেয়, নার্ভ সেই সাড়া মস্তিষ্কে নিয়ে গেলে পর "অনুভূতি" সেখানে হয়। এক টুকরা মখমল-কাপড় গায়ের চামড়ায় কোথাও ঠেকলে সেখানকার সেল যে-রকম সাড়া দেয়, একটা পিন ফুটে গেলে সাড়াটা বিপরীত হয়। সাড়ার রকমারিতে মস্তিষ্ক বুঝতে পারে স্পর্শ কেমন হোলো— আরামের না কষ্টকর।



২১. চামড়ার ভিতরকার গঠনের আর একটি নকশা

ক. তেল প্রস্তুত করার গ্ল্যাণ্ড খ. চুলের মূলাংশ
গ. ঘামের গ্ল্যাণ্ড ঘ. চর্বির পর্দা

শরীরের চামড়ার সাড়া দেবার শক্তি সর্বত্র সমান নয়, হাতের তেলোতে পিন ফোটালে যত ব্যথা লাগে অন্য জায়গায় তত না লাগতে পারে। সব অঙ্গে আমরা সমান ঠাণ্ডা বোধ করি না। মুখের সেলগুলি ঠাণ্ডা সম্বন্ধে অনেকটা অসাড়, কিন্তু গরম সম্বন্ধে নয়; মুখের কাছে তাত আমরা সহ্য

করতে পারি না। সব জায়গায় স্পর্শবোধও সমান নয়। কিন্তু বেদনা অনুভব করার শক্তি সর্বত্রই ছড়ানো। ঠাণ্ডা, গরম, স্পর্শ ও ব্যথার যে-চারটি বোধশক্তি চামড়ার বিশেষভাবে আছে বলা হোলো এর প্রত্যেকটির অনুভূতির জন্য চার রকম বিভিন্ন সেলের সমষ্টি দায়ী। যে-সেলগুলি ঠাণ্ডা লাগলে চট করে সাড়া দেয় সেগুলির গরমে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। দেহের সর্বত্র এই চার রকমের সেলই ছড়ানো আছে, তাই সব জায়গাতেই এই চার রকম অনুভব শক্তিও কম বেশি রয়েছে।

(২) ঘ্রাণ। যে-অভিঘাতে নাকে গন্ধ পাই বা জিবে স্বাদ অনুভব করি, রাসায়নিক অভিঘাতে তার উৎপত্তি। আলো, উত্তাপ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির বিষয়গুলি বাস্তবজাতীয়, কিন্তু গোলাপফুলের গন্ধ নাকে যখন পৌছায়, সেই অনুভূতির মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া জড়িত। নাকের পিছনে দুটি তিনকোণা গর্ত আছে, তার ভিতর ঘোরালো-পেঁচালো নানারকম খোপ। এই সব খোপের গায়ে যে-সেল আছে তারা কতকগুলি রসায়ন (chemicals) সম্বন্ধে খুব সচেতন। এই রসায়নের বিন্দুমাত্র সংস্পর্শে তারা খবর পাঠিয়ে দেয় মগজে এবং তারই ফলে আমরা গন্ধ অনুভব করি। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের কণা ভিন্ন রকম অভিঘাত দেয়, তাদের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার তফাতে। গন্ধবস্তুমাত্রেরই পরমাণুগুলি জল বা স্পিরিটজাতীয় দ্রব ও তরল পদার্থে গোলা অবস্থায় নাকে যাওয়া দরকার। নিছক শুকনো জিনিসের গন্ধ আমরা পেতে পারি না, যেটুকু পাই তার কারণ

হচ্ছে হাওয়ার এবং নাকের ভিতরকার ভিজে বাষ্পকণা তাদের কতক অংশ দ্রব ক'রে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পৌঁছে দেয়। এইসব দ্রব্যের পরমাণুর অভিঘাতের বৈচিত্র্য এবং প্রকোপ অনুসারে আমরা গন্ধের তারতম্য বোধ করি।

(৩) স্বাদ। স্বাদ অনুভব করার বিশিষ্ট সেলগুলি জিব এবং মুখগহ্বরের গায়ে সাজানো থাকে। মানুষ চার রকমের স্বাদ অনুভব করতে পারে টক, মিষ্টি, তিতো ও নোনতা; এই চার রকম স্বাদের জন্য চার রকম পৃথক ধরনের সেল আছে। সাধারণত স্বাদ বলতে আমরা যা বুঝি সেটা ঘ্রাণ ও স্বাদ মেশানো একটা অনুভূতি। নাক টিপে বন্ধ রেখে যদি আমরা কোনো জিনিস খেতে চেষ্টা করি তখনই বুঝতে পারব ঘ্রাণের সঙ্গে স্বাদ কতটা জড়িত। এই রকম ভাবে খেলে চকোলেট ও সন্দেশ বা এক টুকরা আপেল ও পেঁয়াজের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বুঝতে পারব না। সর্দিতে নাক বন্ধ থাকলে সব খাবারই এইজন্য বিস্বাদ বোধ হয়।

(৪) শব্দ। শব্দ অনুভব করার বিশেষ অঙ্গ হোলো কান। হাওয়ার কম্পনে শব্দের উৎপত্তি। এই কম্পনের ঢেউগুলি যখন কানের উপর গিয়ে ধাক্কা মারে তখন আমাদের মগজ শব্দ অনুভব করে। কান অত্যন্ত জটিল যন্ত্র। বাইরে থেকে আমরা কান ব'লে যে-অঙ্গটুকু দেখি তা সম্পূর্ণ নয়। সেটা কেবল একটা চোঙের মতো, তার কাজ শব্দের ঢেউগুলিকে ধ'রে সরু নল দিয়ে ভিতরে পৌঁছে দেওয়া মাত্র। কানের আসল যন্ত্রপাতি থাকে

লুকিয়ে মাথার ভিতরে, খুলির হাড়ের অন্তরালে। এত পেলব এই যন্ত্র যে হাড়ের আবরণের মধ্যে তাকে সুরক্ষিত করা হয়েছে।

কানের তিনটি অংশ :

ক। বহিরঙ্গ (trumpet)—শব্দ ধরবার জন্য মাথার দু-দিকে বেরিয়ে থাকে যে-অংশ চোঙের মতো। অধিকাংশ জন্তুর কানের এই অংশটি ঘোরানো ফেরানো যায়, তাতে তারা ইচ্ছামতো যে-দিক থেকে শব্দ আসে সেই দিকে কান ফেরাতে পারে ; তাতে ক'রে কেবল যে ভালো শুনতে পায় তা নয়, শব্দের দিক নির্ণয় করার ভারি সুবিধা হয়। মানুষের চেয়ে কুকুর, বেড়াল প্রভৃতির এই কারণে শব্দের অনুভূতি বেশি তীক্ষ্ণ। কিন্তু মানুষের কানের বহিরঙ্গের সঙ্গে সে-রকম কোনো মাংসপেশীর যোগ নেই যাতে ইচ্ছামতো তাকে নাড়াতে পারা যায়। কদাচিৎ কোনো ব্যক্তির এই ক্ষমতা দেখলে সাধারণের কৌতুক বোধ হয়।



২২. কান

ক. মধ্যাঙ্গের সূক্ষ্ম হাড়-সমষ্টি
খ. আভ্যন্তরীণ অঙ্গ
গ. আভ্যন্তরীণ অঙ্গের সরু নল
ঘ. শামুকের মতো পেঁচালো নলাংশ
ঙ. ইউস্‌টাকিয়াল টিউব
চ. পর্দা

খ। মধ্যাঙ্গ (middle ear)। বহিরঙ্গ যেখানে সরু হয়ে শেষ হয়েছে ভিতরের দিকে, সেখানে নালির পথ অবরোধ করে একটি

পাতলা পর্দা আছে। এই পর্দার অপর দিকে কানের মধ্যাঙ্গ। এখানে বিশেষ কোনো যন্ত্র নেই, গুহার মতো গর্ত মাত্র অবস্থিত। তার এক দিকে পাতলা পর্দা। ভিতরদিকে কানের আসল যন্ত্রপাতি। মধ্যাঙ্গের গর্তটা সেইজন্য একটা খোল বা ঢোল বাদ্যযন্ত্রের মতো। খোলের চামড়ার পর্দায় চাঁটি মারলে যেমন তার কম্পন সমস্ত যন্ত্রটিকে কাঁপিয়ে ধ্বনিত করে তোলে, আমাদের কানের পর্দারও সেই কাজ। হাওয়ার কম্পন এসে লাগে পর্দার উপর, পর্দা তাতে কেঁপে উঠে তার কম্পনের ঢেউগুলিকে চালিয়ে দেয় সরু সরু তিনটি হাড়ের ভিতর দিয়ে আভ্যন্তরীণ অঙ্গে, যেখানে কানের আসল কলকব্‌জা থাকে। কোনো কারণে পর্দাটি ফুটো হোলে লোকে কম শোনে, শব্দ এসে আঘাত করলেও তাকে কাঁপাতে পারে না, কাজেই ভিতর-কানে শব্দের ঢেউ পৌঁছায় না।

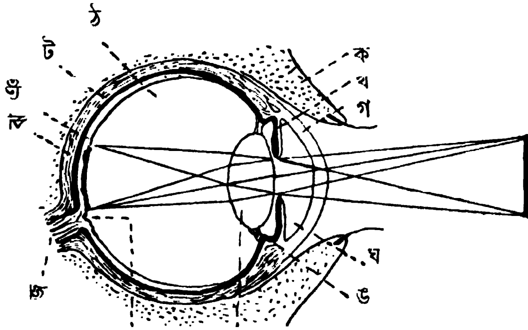
গ। আভ্যন্তরীণ অঙ্গ (inner ear)। এর চেহারা কতকটা শামুকের মতো, একটা নলকে নানারকম করে পেঁচিয়ে যেন জড়পুঁটুলি করা। নলটি কোথাও সরু, কোথাও মোটা। নলের ভিতরে জলীয় রস ভরা আছে। পর্দার কম্পনে এই জল কেঁপে উঠে আঘাত করতে থাকে নলের গায়ের স্নায়ুমণ্ডলীকে। স্নায়ুগুলি আঘাতের খবর বহন ক'রে মগজে যেমন পৌঁছে দিতে থাকে আমরা অমনি শব্দ অনুভব করতে থাকি। আঘাতের প্রকোপ যেমন কম বেশি হয়, শব্দও তেমনি ক্ষীণ বা জোরালো ব'লে আমাদের মনে হয়। শব্দের ঢেউ যত দ্রুত তালের হয় আমরা তত চড়া স্বর শুনি।

শব্দের অভিঘাত গ্রহণ ক'রে মগজে তা পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া কানের আভ্যন্তরীণ অঙ্গের আর-একটি বিশেষ কাজ আছে। এই অঙ্গের সাহায্যে আমাদের শরীরের ব্যালান্স (balance), ভারসাম্য, আমরা ঠিক রাখতে পারি। আমরা এক মুহূর্তও সমানভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতুম না, কানের এই অদ্ভুত যন্ত্রটি না থাকলে।

আলোর ঢেউ শব্দের ঢেউ অপেক্ষা হাওয়ার ভিতর দিয়ে দ্রুত গমন করে। সেইজন্য বিদ্যুতের চমকানি আমরা আগে দেখতে পাই, তার খানিকটা পরে বজ্রের আওয়াজ আমাদের কানে এসে পৌঁছায়।

(৫) দৃষ্টি। দর্শনেন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখের নকল করেছি আমরা ছবি তোলার ক্যামেরায়। চোখের ভিতর যে-সব কলকব্জা আছে তার প্রত্যেকটির যথাযথ প্রতিরূপ আমরা দেখতে পাব ক্যামেরাতে। তাই যাঁরা ছবি তোলায় অভ্যস্ত তাঁরা চোখের কার্যপ্রণালী সহজেই বুঝতে পারবেন। চোখের প্রধান অঙ্গ দুটি—সামনের দিকে একটি স্বচ্ছ কাঁচের মতো লেন্স যার ভিতর দিয়ে আলোক-রশ্মি প্রবেশ করে ও পিছনে একটি পর্দা যার উপর তার ছাপ গিয়ে পড়ে। বাইরের জিনিস থেকে সূর্যের রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে চোখের উপর যখন এসে পড়ে, লেন্স সেই রশ্মিগুলিকে সংকুচিত ক'রে নিয়ে পিছনের পর্দার উপর ফেলে। বাইরের দৃশ্যের প্রসার যত বিস্তৃতই হোক চোখের সামনে লেন্স থাকাতে সুবিধা এই যে, চোখের পর্দার অল্প পরিসর সত্ত্বেও তার উপর

সমস্ত দৃশ্যটার ছাপ পৌঁছায়। ক্যামেরাতেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। ক্যামেরার লেন্স যে-দৃশ্যের দিকে মুখ করা থাকে তার



২৩. চোখ

ক. চোখের পাতা
খ. আইরিস
গ. কর্ণিয়া
ঘ. লেন্সের সামনের জলভরা অংশ
ঙ. লেন্সের পেশী
চ. লেন্স
ছ. জ. চোখের নার্ভ-সীমান্ত
ঝ. স্ক্লেরা
ঞ. রেটিনা
ট. কোরয়ড পর্দা
ঠ. স্বচ্ছ জেলির মতো পদার্থ-ভরা গহ্বর

একটি ছোট্ট প্রতিবিম্ব গিয়ে পড়ে ফিল্মের উপর। যে-সব ক্যামেরায় পিছন দিকে ঘষাকাঁচের ব্যবস্থা আছে আমরা তার উপর সেই প্রতিবিম্ব ইচ্ছা করলে দেখতে পারি।

চোখের ভিতর আলো ঢোকবার ব্যবস্থার জন্য এই কয়েকটি অঙ্গ আছে :

ক। চোখের পাতা (eye-lid)। চোখের পাতার কাজ হোলো বাইরের আঘাত প্রতিরোধ করা। চোখের পাতার চামড়ার নিচে পাতলা রবারের পাতের মতো একটি জিনিস আছে তাকে বলে কার্টিলেজ (cartilage)। চোখের পাতা খুব জোরে বন্ধ করলে চারদিকের মাংসপেশীগুলির সংকোচনে কার্টিলেজগুলি বেশ শক্ত হয় ও আঘাত প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা বাড়ে।

খ। গ্রন্থি (glands)। চোখের পাতার ভিতরের দিকে ছোটো ছোটো গ্রন্থি থাকে। সে-সব গ্রন্থি থেকে ক্রমাগত এক রকম জলীয় পদার্থ বের হয়। সর্বদা ভিজে থাকার দরুন চোখের পাতা খুব সহজে ওঠানামা করতে পারে এবং ধুলাবালি কোনো রকম ময়লা গেলে সহজে ধুয়ে বের করে দিতে পারে।

গ। কর্ণিয়া (cornea)। পূর্বেই চোখের সঙ্গে ক্যামেরার বাক্সের তুলনা করা হয়েছে। তুইয়েরই বেলা দেখি যে, চারদিক বন্ধ, কেবল সামনের দিকে গোল একটি জানালার মতো আলো প্রবেশ করবার পথ আছে। এই পথ শক্ত এবং স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে ঢাকা। এই আবরণটির নাম কর্ণিয়া।

ঘ। আইরিস বা ডায়েফ্রাম (iris or diaphragm)। কর্ণিয়ার ঠিক পিছনেই আর-একটি পর্দা থাকে, এই পর্দাটি স্বচ্ছ নয়। ব্যক্তিভেদে তার নানাপ্রকার রং হোতে পারে। তারো মাঝখানে একটি গোল ছিদ্র পথ। এই পর্দার নাম আইরিস বা ডায়েফ্রাম। আইরিসের রং অনুসারে কালো, কটা, নীল ইত্যাদি নানা রঙের চোখ দেখতে পাওয়া যায়।

ঙ। চোখের তারা (pupil)। আইরিসে যে-ছিদ্রটির কথা বলা হোলো তাকে বলে চোখের তারা।

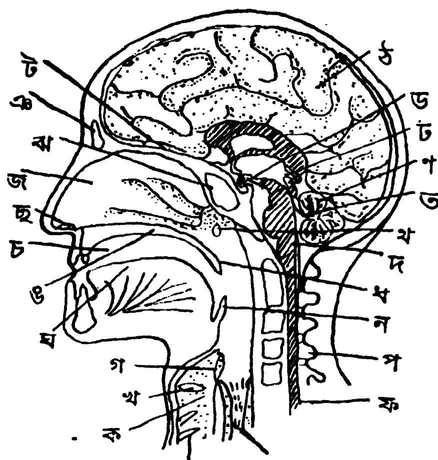
চোখের তারা প্রয়োজনমতো ছোটো বড়ো করার ব্যবস্থা আছে। কম আলোতে বা দূরের জিনিস দেখতে হোলে চোখের তারা বড়ো হয়, আবার বেশি আলোয় বা কাছের জিনিস দেখবার বেলা ছোটো হয়।

চ। লেন্স (lens)। চোখের তারার পিছনে থাকে লেন্স। মাংসপেশীর সংকোচন প্রসারণে লেন্সের আকৃতির পরিবর্তন হয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা লেন্সের শক্তি বাড়ানো কমানো হয়। কাছের জিনিস দেখবার বেলা লেন্সের শক্তি বাড়ে ও দূরের জিনিসের বেলা কমে।

ছ। চোখের পর্দা (retina)। বাইরের ছবি প্রতিফলিত হয় চোখের পিছন দিককার পর্দার উপর। এই পর্দার গায়ে অসংখ্য সূক্ষ্ম নার্ভ জাল বিস্তার করে থাকে। সেগুলি চোখের পিছনে একত্রিত হয়ে অপটিক নার্ভ (optic nerve) গঠিত হয়। এই নার্ভটি চোখের সঙ্গে মগজের যোগ রক্ষা করে। যা-কিছু জিনিস আমাদের চোখের সামনে এসে পড়ে তার থেকে আলোর রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে অনবরত চোখের পর্দার উপর ধাক্কা দেয়। পর্দা সেই অভিঘাত অপটিক নার্ভের সাহায্যে মগজে পাঠায় এবং তারই ফলে আমরা নানাবিধ ছবি দেখি। চোখ মেলে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ ছবি দেখার বিরাম নেই মুহূর্তের জন্যও।

মগজ

বাহ্যেন্দ্রিয়ের কাজ হচ্ছে বাইরের অভিঘাত গ্রহণ করা। নার্ভের কাজ হচ্ছে সেই অভিঘাত বহন করে নিয়ে যাওয়া মগজে। এখন আমাদের জানতে বাকি মগজের কী রকম গঠন ও তার কী কাজ।



২৪. মানুষের মাথার ভিতরের গঠন

ক. শ্বাসনালি খ. স্বরনালি গ. গ্লোটিস (glottis) ঘ. জিব ঙ. প্যালেট (শক্ত) চ. মুখগহ্বর ছ. নাকের গর্ত জ. নাকের গহ্বর ঝ. spheroidal sinus ঞ. frontal sinus ট. olfactory lobe ঠ. মগজ ড. পিটিউটরি গণ্ড ঢ. 3rd ventricle ণ. cerebellum ত. 4th ventricle থ. ইউস্‌টাকিয়ান দ. মেডুলা ধ. প্যালেট (নরম) ন. epiglottis প. শিরদাঁড়ার হাড় ফ. spinal cord.

মগজকে সাধারণ কথায় মাথার ঘি ব'লে থাকি। ঘিয়ের মতো তরল পদার্থ কিন্তু তা নয়। নরম হোলেও তার বিশেষ আকার আছে এবং এমন চমৎকারভাবে তার ভাঁজগুলি গুছিয়ে রাখা যে, অনেকখানি বস্তু খুব অল্প জায়গায় মাথার খুলির মধ্যে ধরানো থাকে। মোটের উপর মগজ দু-ভাগে বিভক্ত, সামনের পিণ্ডটা বড়ো,

পিছনেরটা ছোটো। মগজের এই দুই অংশে আমাদের মনের অধিষ্ঠান; ভাবনা চিন্তা যা কিছু মানসিক প্রক্রিয়া এইখানে তার উৎপত্তি। মগজের সেলগুলি এত পেলব, তাদের এত নানারকমের কাজ করতে হয়, আর তাদের গঠনপ্রণালীও এত জটিল যে, তাদের অতি সাবধানে রাখতে হয় খুলির মোটা আবরণের মধ্যে।

মগজকে দু-ধরনের কাজ করতে দেখা যায়। তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ হচ্ছে প্রতিবর্তী ক্রিয়া (reflex action)। হাতে ছেঁকা লাগলে হাত সরিয়ে নেওয়ার ভিতর কোনো চিন্তার কথা নেই, এ কেবল বাইরের অভিঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সহজ প্রত্যুত্তর। কিন্তু কঠিন কাজ হচ্ছে যেখানে বিচারশক্তি খাটাতে হয়, যেখানে স্মরণশক্তির প্রয়োজন। প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উৎপত্তি মগজের নিচের দিকটাতে। এমন কি মেরুদণ্ডের ভিতর যে নার্ভবস্তু আছে সেখান থেকেই বেশির ভাগ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার জন্ম। মেরুদণ্ডের ভিতর নার্ভবস্তু আসলে মগজেরই অংশবিশেষ কিন্তু বুদ্ধি-বিচারশক্তির উৎপত্তিস্থল মগজের উপরের ও সামনের অংশে। সেখানকার অসংখ্য সেল আমাদের স্মৃতিমন্দির। ইন্দ্রিয়-গুলি বাইরের জগত থেকে যা কিছু অনুভূতি সংগ্রহ ক'রে আনে তার কিছু কিছু জের এখানে থেকে যায়। মগজের খোপে খোপে সেগুলি পুঁজি ক'রে সাজিয়ে রাখা থাকে, যাতে দরকার মতো যখন ইচ্ছে কাজে লাগানো যায়। স্মৃতিভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার উপর আমাদের বুদ্ধিবিচারশক্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিটে অজস্র ঘটনা আমাদের

ইন্দ্রিয়গোচর হচ্ছে। সারাজীবন ধ'রে তার কত স্মৃতি মগজে গুঁজে রাখতে হয় তার হিসাব করা অসম্ভব। একটা সদর আপিসের কাজ চালাবার জন্য কত কেরানী, কত ফাইল, কত খতিয়ান প্রভৃতির বিপুল আয়োজন রাখতে হয়। মাথার খুলির মধ্যে একটুখানি জায়গায় তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম কাজ চলে না; এই জটিল কাজ চালাবার খুব সহজ অথচ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা রয়েছে।

দেহক্রিয়াতত্ত্ব

(উদ্ভিদের)

পূর্বেকার কয়েক অধ্যায়ে কেবল জন্তুদের শরীর চালনা সম্বন্ধে আলোচনা করা গেছে। গাছপালার বিষয় কিছু উল্লেখ করা হয়নি। জন্তুদের দৈহিক গঠন গাছের তুলনায় জটিল। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর প্রাণীর জীবন-প্রণালীর মধ্যে মূলত বিশেষ পার্থক্য নেই। সমস্ত প্রাণীরই শরীর-গঠনের ভিত্তি হচ্ছে জীবকোষ।

বাইরে থেকে দেখলে গাছ ও জন্তুর মধ্যে যে তফাত প্রথমেই নজরে পড়ে সে হচ্ছে : গাছপালা নড়তে পারে না, জন্তুজানোয়ারের অবাধ গতি। তাদের জীবনধারার এই যে মূল বৈশিষ্ট্য—এর ভিতরেই কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে তাদের অধিকাংশ পার্থক্যের।

গাছ এক জায়গায় মাটির ভিতরে শিকড় চালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এক চুলও তার এদিক-ওদিক যাবার উপায় নেই। তাই হাত-পা'র মতো কোনো চলাফেরার অঙ্গ তার গড়ে ওঠেনি। তাকে খাবার সংগ্রহ করতে হয়, যেখানে আছে সেখান থেকেই। মাটির তলায় সে ছড়িয়ে দেয় জালের মতো বিস্তর শিকড়। মাটিতে যা খাবার পায় শিকড় তাই শুষে নেয়, খাদ্যের

উপকরণগুলি জলে গোলা না হোলে শুষে নিতে পারে না। তাই মাটিতে রস থাকা দরকার। মরুভূমির মতো একেবারে নীরস জমিতে সেইজন্য গাছপালা জন্মায় না।

মাটি থেকে গাছ খাদ্যের যে উপকরণগুলি সংগ্রহ করে তা হচ্ছে নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P) ও পোটাসিয়াম (K)। এই তিনটে প্রধান, তবে অল্প-স্বল্প পরিমাণে নিতে হয় আরো কয়েকটা ধাতববস্তু, যেমন লোহা (Fe.), গন্ধক (S.), ম্যাগনিসিয়াম (Mg.), ক্যালসিয়াম (Ca.), ইত্যাদি। জলের সঙ্গে শিকড়ের ভিতর ঢুকে এই খাবারগুলি উপরে উঠতে থাকে, ডালপালা পেরিয়ে একেবারে পাতার মধ্যে গিয়ে পড়ে।

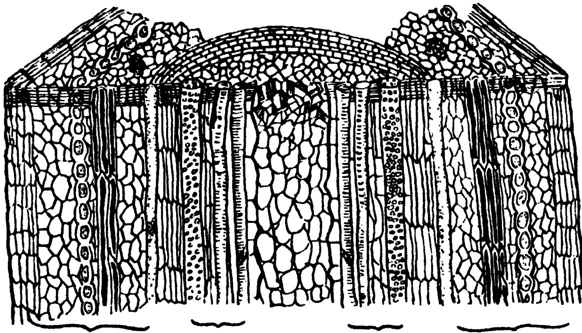
গাছের পাতার সঙ্গে কতকটা আমাদের পেটের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পেটের ভিতর জন্তুরা তৈরী খাবার নিয়ে সেটা ভেঙেচুরে শরীরের রক্তপ্রবাহে গ্রহণ করার উপযুক্ত করে তোলে। পাতার কিন্তু কাজ আরো বেশি। সে তৈরী খাবার পায় না, তাকেই খাবার তৈরি করে নিতে হয়। পাতাগুলি গাছের যেন পাকশালা। গাছের খাবার সামগ্রী পাক করার জন্য কাঠ বা কয়লার বদলে পাতা ব্যবহার করে সূর্যকিরণকে। কিন্তু শিকড় যে-উপাদানগুলি পাতার কাছে পাঠায় কেবল তা দিয়ে বলকারক উপাদেয় খাবার প্রস্তুত হয় না। যে-জিনিসটার প্রধান অভাব রয়ে যায় তা হচ্ছে অঙ্গার। মাটি তা দিতে পারে না। পাতা এই জিনিসটি সংগ্রহ করে অভিনব উপায়ে—হাওয়া থেকে।

শুনে প্রথমটা বিশ্বাস হয় না, হাওয়া থেকে কী ক'রে খাবার জিনিস আসবে, বিশেষত অঙ্গার। কিন্তু সত্যই হাওয়াতে বিস্তর অঙ্গার আছে, CO_2 গ্যাসের আকারে। প্রতি আড়াই হাজার ঘন-ফুট হাওয়াতে ১ ঘন ফুট CO_2 গ্যাস আছে। আমাদের মনে থাকবার কথা, জন্তুজানোয়ার হাওয়ার অক্সিজেন নিয়ে নিশ্বাস ফেলবার সময় CO_2 গ্যাস হাওয়ায় ছেড়ে দেয়। বাতাসে সেটা জমা হয়, গাছের পাতা তাকে ব্যবহার করে। পাতার তলার দিকে ছোটো ছোটো গর্ত আছে, আমাদের গায়ের চামড়ায় যেমন ঘাম বেরোবার অসংখ্য বিঁদ থাকে। গর্তের মুখগুলি দরকার মতো খোলে বা বন্ধ হয়। দিনের বেলায় পাতার ভিতর হাওয়া ঢোকে এই দরজা দিয়ে। হাওয়ার অঙ্গার নিয়ে রান্না চড়ে, যেই সূর্যের আলো এসে পড়ে পাতার উপর। C, H, O, N, P, K, Fe, S, প্রভৃতি সব মালমসলা তখন পাতার ভাঁড়ার ঘরে রয়েছে মজুত। রান্নার জোগাড়ের অভাব কিছু নেই, তাই খাবার যা প্রস্তুত হয় বেশ উপাদেয়, কেবল গাছের নয় আমাদের পক্ষেও তা মুখরোচক। আলু, পটল, বেগুন, কপি প্রভৃতি সব্‌জি, আম, লিচু, কাঁঠাল প্রভৃতি ফল যখন খাই তখন পাতার রান্নার সুস্বাদ উপভোগ করি।

পাতার ভিতর খাবার যেমন প্রস্তুত হোতে থাকে তার পুষ্টিকর রস গাছের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নেমে চলে যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেটা ব্যবহার করে নিজেদের পুষ্টির জন্য। উদ্‌বৃত্ত যা থাকে তা গাছ ফেলে দেয় না—পুঁজি করে রাখে শিকড়ে, ফলে, বীজে। জন্তুরা সেই তৈরী খাবারগুলি খেয়ে প্রাণধারণ করে।

শিকড় থেকে পাতায়—পাতা থেকে আবার শিকড়ে, দুটি প্রবাহ চলতে থাকে দিবারাত্র গাছের মধ্যে। খাবারের কাঁচামাল ওঠে উপর দিকে, পাকামাল নামে নিচের দিকে। এদের বয়ে নেবার জন্য পৃথক দু-শ্রেণীর নালি আছে। এক শ্রেণীর নালি থাকে ছালের নিচেই কাণ্ডের বাইরে-পিঠে, অন্য নালিগুলি ভিতরে।

রসপ্রবাহের নালি যেন আছে বোঝা গেল, কিন্তু স্রোত বয় কী



২৫. গাছের গুঁড়ির ভিতরের গঠন

ক. ছাল (cortex) খ. কাঠ (woodcells) গ. মজ্জা (pith)

ক'রে। জন্তুদের শরীরে রক্তপ্রবাহ চালাবার জন্য রয়েছে হৃদ্‌যন্ত্র। গাছের তো হৃদ্‌যন্ত্র নেই পাম্পের কাজ করবার জন্য জলস্রোত উপরদিকে উঠতে পারে না আপনা থেকে। অথচ অনেক বনস্পতি আছে তিন-চার শ' ফিটেরও উঁচু, এত উপরে জল ওঠে কী ক'রে। এ একটা বিষম সমস্যা। বিজ্ঞানীরা নানা

কৌশলে এর মীমাংসার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দেখা গেছে পদার্থ-বিজ্ঞানের কোনো আইনই খাটে না এক্ষেত্রে। আচার্য জগদীশ-চন্দ্র যে যুক্তি দিয়েছেন তা তবু বিশ্বাসযোগ্য। তিনি বলেন, আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র যেমন একবার সংকুচিত হয় আবার প্রসারিত হয় তেমনি গাছের প্রত্যেক সেলেরই এইরকম অল্পবিস্তর অনায়ত্ত কম্পন আছে। তাতেই পাম্পের কাজ হয়; একটা সেল তার নিচের সেলের রস নিয়ে উপরের সেলে ঠেলে তুলে দেয়। প্রত্যেক সেলই যেন একটা পাম্প। ক্ষুদ্রকায় হোলেও অসংখ্য পাম্পের জোরে রসপ্রবাহ চলতে থাকে এবং গাছের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তা উঠে যায়।

জন্তুজানোয়ারের যেমন বৈচিত্র্য—এককোষী অ্যামিবা একদিকে আর জটিল অবয়ববিশিষ্ট মানুষ আর-এক প্রান্তে,—গাছগাছড়ার মধ্যেও ঠিক তেমনি বৈচিত্র্য দেখা যায়। শ্যাওলা জাতীয় সব্‌জির শরীরের গঠন খুব সাদাসিধে, কয়েকটি সেলের সমষ্টি মাত্র। বর্ষাকালে ময়দা, পাঁউরুটি প্রভৃতিতে যে-ছাতা পড়ে (ব্যাঙের ছাতাও সেই জাতীয় উদ্ভিদ) তারও গঠন জটিল নয়; তার পর কতরকম শাকপাতা, ঘাস ও ছোটোখাটো গাছ দেখা যায় যারা তাদের দু-চারটে সবুজ পাতা দিয়ে মাটির উপর একটু শ্যামলতার আমেজ বুলিয়ে দিয়েই খালাস; তা ছাড়া বনবাদাড়ের শাল, শিমুল, সেগুন প্রভৃতি বিশাল মহীরুহও আছে।

উদ্ভিদজগতে ক্রমবিবর্তনের নিচের ধাপে যে-সব গাছগাছড়া তাদের ছেড়ে দিলে উচ্চস্তরের যত রকম গাছ আছে তাদের

শরীরগঠনের চারটি প্রধান এবং অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ দেখা যায়:

(১) কাণ্ড—গুঁড়ি এবং ডালপালা নিয়ে দেহের কাঠামো, যার উপর গাছের আকৃতি নির্ভর করে এবং যা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ধারণ করে রাখে। এই কাঠামোর প্রধান বস্তু হচ্ছে কাঠ; সেটা একেবারে নিরেট অসাড় জিনিস নয়। সরু, লম্বা এবং কঠিন-আবরণে আবদ্ধ সেলসমূহে তা তৈরী। তার বাইরে থাকে বল্কল।

(২) পাতা—গাছের সবুজ আচ্ছাদন; সূর্য রশ্মি ধরবার জন্য যে-অংশ পাখা মেলে দেয় আকাশে। পাতার গড়ন এমন চিতালো এবং ডালে এমন নিপুণ ভাবে তা সাজানো যাতে প্রত্যেক পাতাই যথাসম্ভব সূর্যকিরণ পেতে পারে।

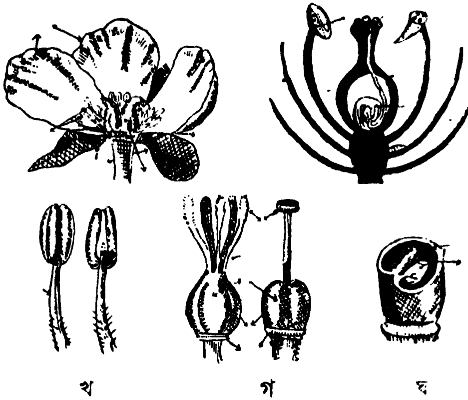
(৩) শিকড়—মাটি কামড়ে ধ'রে দেহযষ্টি খাড়া রাখে, এবং মাটি থেকে জল ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ক'রে উপর দিকে পাঠিয়ে দেয়।

(৪) ফুল ও ফল—এর প্রথমটি গাছের জননেন্দ্রিয়। ফুলের মধ্যে কলকৌশল বিস্তর, তার সবিশেষ বর্ণনা এখানে সম্ভব নয়। এইটুকুই এখন জানলে চলবে যে ফুলের বাহ্যরূপ (পাপড়ির ভাঁজ, রঙের বাহার, মিষ্টি গন্ধ) এবং ভিতরের গঠন (স্ট্যামেন, পিস্টীল প্রভৃতি যাবতীয় অঙ্গ) সব-কিছুর একমাত্র উদ্দেশ্য জননক্রিয়ায় সাহায্য করা। জন্তুজানোয়ারেরা চলাফেরা করতে পারে ব'লে প্রয়োজন মতো স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হোতে তাদের কোনো বাধা নেই। গাছ তা পারে না সেইজন্য জননের কাজে অন্যের সাহায্য নিতে হয়।



২৬. ফুল-পাতার বৈচিত্র্য

পোকামাকড়কে রঙের বাহারে, গন্ধের মাদকতায়, মধু-র মিষ্টি আস্বাদের লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসে ফুলের কাছে, তাদের দাড়ি-গোঁপে হাতে-পায়ে মাখিয়ে দেয় পুং-রেণু। সেই রেণু স্ত্রী-অঙ্গে লেগে জন্ম দেয় বীজের। গাছ স্থাণু ব'লে জননক্রিয়া সুসম্পন্ন করার জন্য এত ছলনা তাকে অবলম্বন করতে হয়েছে।



২৭. ফুলের বিভিন্ন অংশ পৃথক করে দেখানো

ক. পাপড়ি খ. স্ট্যামেন গ. পিস্‌টিল ঘ. ওভারির অভ্যন্তর

স্থাণু ব'লেই আবার সন্তান পালন ক'রে তোলার নানান কৌশল করতে হয় তাকে। মানুষের কথা বাদ দিলেও অন্যান্য সমস্ত জন্তুই ঘুরে ফিরে খাবার সংগ্রহ ক'রে বাচ্চাদের বড়ো করে তোলে, তার পর ছেড়ে দেয় তাদের নিজেদের চ'রে খেতে। গাছ যদি

একই জায়গায় নিজের আওতায় ক্রমান্বয়ে বীজ ফেলতে থাকে তবে তার অধিকাংশই মরে যায় প্রয়োজনমতো মাটির রস, হাওয়া ও আলো না পেয়ে, চারা হয়ে বড়ো হবার সুযোগ পায় না তেমন। নিজের কাছ থেকে দূরে বীজ ছড়িয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করতে হয় তাকে। অনেক দূরে যাতে ভেসে যেতে পারে তারজন্যে জলের ধারের গাছের ফল হালকা খোলস দিয়ে মোড়া থাকে (যেমন নারকেল); শুকনো ডাঙার উপর যে-গাছ জন্মায় তার কোনো বীজে পাখা আছে উড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়বার জন্য (যেমন শাল), কারো আছে তুলোর মতো শুঁয়ো, সহজে হাওয়ায় ভেসে বেড়াবার জন্য (যেমন শিমুল, কাশ)।

ছড়াবার কৌশল অনেক, কিন্তু যতই হোক পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, তাই ভয়ে ভয়ে গাছ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বীজ তৈরি করে। হাজার হাজার বীজের মধ্যে অন্তত দুটো চারটেরও ফাঁকা জায়গায় ভালো মাটির সন্ধান মিলতে পারে। ধরে নিলুম সরস মাটিতে প'ড়ে বীজ থেকে চারা জন্মাল, তাদের শিকড় যতদিন না গজায় তারা খাবে কী। পাখিরা উড়ে গিয়ে খাবার জুটিয়ে এনে বাচ্চাদের খাইয়ে দেয়। কিন্তু বীজের সঙ্গে মূল গাছের আর সম্পর্ক থাকে না যেই সে খ'সে যায়। কচি চারা যাতে জন্মাবামাত্র খাবারের অভাবে মরে না যায়, তারই ব্যবস্থা করার জন্য গাছ তার বীজের মধ্যে অনেকখানি করে খাবার ভরে দিয়ে তবে তাদের ছেড়ে দেয়। বীজ বা ফলের ভিতর গাছ যে খাবার ভরে দেয় আমরা চুরি করে প্রায়ই সেই খাবার খেয়ে ফেলি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে গাছ ও জন্তুর জীবনপ্রণালীর পার্থক্যের গোড়াকার কথা—গাছ স্থাণু, জন্তু সচল। এই মূলগত পার্থক্যের কথা মনে রাখলে তাদের শারীরিক গঠন, খাবার সংগ্রহের প্রথা, বংশবৃদ্ধির উপায় প্রভৃতি সবই তলিয়ে বুঝতে পারব। এই কথাটা মনে রেখে এখন দেখা যাক উদ্ভিদ ও জন্তু এই দুই প্রধান জীবশ্রেণীর মধ্যে কী কী বিষয়ে মিল ও কোথায় পার্থক্য আছে :

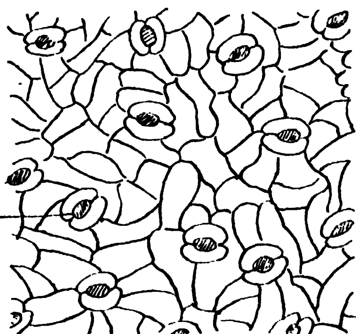
(১) গাছের ডানা, লেজ, হাত পা প্রভৃতি চলাফেরার কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই। মাংসপেশীও নেই। বরং রয়েছে অনড় শিকড়, মাটি কামড়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকার জন্য।

(২) খাবার হজম করার জন্য পাকস্থলী, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্র-প্রণালী গাছের দরকার নেই। জন্তুর এগুলি দরকার কারণ সে খায় তৈরী জটিল খাদ্য। সেই খাদ্য এই সব যন্ত্রের সাহায্যে ভেঙে-চুরে অক্সিজেন দিয়ে পুড়িয়ে তবে শরীর গ্রহণ করতে পারে। যে-সব সহজ ধাতব জিনিস গাছের আহার্য তা পোড়ানো যায় না, পোড়াবার দরকারও হয় না। গাছের খাদ্য-বস্তুর ভিতর সুপ্ত শক্তি বিশেষ নেই। তাকে সেইজন্য বাইরে থেকে অন্য উপায়ে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়।

(৩) সুপ্ত শক্তিবিশিষ্ট খাবার থেকে জন্তুরা শরীর ধারণ করে। গাছ শক্তি লাভ করে সূর্যরশ্মির শক্তি আহরণ ক'রে। এই দিক থেকে দেখলে গাছ শক্তি-সঞ্চয়কারী, জন্তু অপচয়কারী। বাইরে থেকে শক্তি সঞ্চয় ক'রে গাছ যে-সব বস্তু গ'ড়ে তোলে জন্তু তা খেয়ে নষ্ট করে।

(৪) সূর্যকিরণের দ্বারা খাবার প্রস্তুত করার ব্যাপারে উদ্ভিদকে সাহায্য করে পাতার সবুজ রং (chlorophyll)। এই রঙের অদ্ভুত ক্ষমতা, আলো থেকে শক্তি আহরণ করা। জন্তুদের শরীরে এই সবুজ রঙের মতো কোনো পদার্থ নেই।

(৫) জন্তুর প্রধান প্রয়োজন খাবার; অন্নের ব্যবস্থা তাদের জীবনের প্রধান চিন্তা। কিন্তু গাছের প্রধান চিন্তা মনে হয় সূর্যের আলো সংগ্রহ; তারজন্যে সে কত চেষ্টাই না করে। মাটি ছেড়ে যেখানে আলো বেশি পাবার সম্ভাবনা তার দিকে ওঠবার কত উপায়,—পাতাগুলি চিতোলো ক'রে মেলে দিয়ে আলো ধরবার কত ফন্দি।



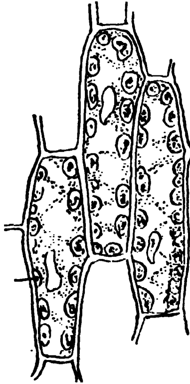
২৮. পাতার নিচে হাওয়া ঢোকার গর্ত (ক)

(৬) নিশ্বাসপ্রশ্বাস ফেলার ব্যবস্থা গাছ ও জন্তু দু'য়েরই আছে। কিন্তু প্রণালীর তফাত। এই কাজের জন্য জন্তুর বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে—নাক ও ফুসফুস। গাছ প্রায় সারা দেহ দিয়ে প্রশ্বাস নেয়। প্রত্যেক পাতার তলায় অসংখ্য বিঁদ আছে তার মধ্যে দিয়ে হাওয়া ঢুকতে ও বেরোতে পারে। জন্তুরা সারাক্ষণ কেবল

O_2 নেয় ও CO_2 বের করে দেয়। গাছ রাত্রে অর্থাৎ অন্ধকারেই কেবল এই কাজ করে, দিনমানে অর্থাৎ সূর্যের আলোতে ঠিক তার উলটো প্রণালী চলে। তখন কেবল CO_2 সে গ্রহণ করে এবং O_2 বাতাসে ফিরিয়ে দেয়। গাছ এইজন্য রাতের বেলায় হাওয়া দূষিত করে, দিনে করে শোধন।

(৭) গাছের ফুসফুস, হৃদয়, রক্ত, মাংসপেশী—এ সব কিছুই নেই। এই সব অবয়বের কাজ অন্য উপায়ে কী ক'রে গাছের বেলায় সম্পন্ন হয় তা আগেই বলা হয়েছে।

(৮) উদ্ভিদ ও জন্তু, এদের সেলের আকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গাছেল সেলে সেলুলোজের (cellulose) কঠিন আবরণ থাকে, তারা অপেক্ষাকৃত বড়ো ও চৌকোণ। উদ্ভিদের চৌকোণা বাক্সর মতো সেল অণুবীক্ষণে প্রথম ধরা পড়ে, তার থেকেই cell কথাটার উৎপত্তি। অথচ জন্তুদের জীবকোষ একেবারেই সেলের মতো দেখতে নয়। তাদের সাধারণত কঠিন আবরণ নেই।


২৯, উদ্ভিদ-সল

(৯) বংশবৃদ্ধির প্রণালীর বিভিন্নতা সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে—পুনরাবৃত্তির দরকার নেই।

(১০) সবশেষে যে-পার্থক্যের কথা বলছি সেটা বড়ো

রকমের। গাছ ও জন্তুর মধ্যে এই বিষয়ে খুব অনেকখানি ব্যবধান।

আমরা জন্তুদের বেলায় দেখি তাদের অনেকরকম ইন্দ্রিয় আছে। ইন্দ্রিয়গুলির মগজের সঙ্গে যোগ নার্ভমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে। গাছের এসব কিছুরই বালাই নেই। তাদের না আছে নাক, কান, চোখ, না আছে নার্ভমণ্ডলী, না আছে মগজ। সেইজন্য তাদের চিন্তা, স্বাধীন ইচ্ছা বা বিচারশক্তি তো নেই-ই, তারা শুনতে বা দেখতে পায় না, আঘাত অনুভব করে কি না তাও সন্দেহ। এই বিষয় জন্তুরা উদ্ভিদজগতকে অনেক অতিক্রম করে গেছে। বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতে গাছপালার জন্তুদের তুলনায় কতখানি সাড়া দিতে পারে সেই বিষয় আচার্য জগদীশচন্দ্র নতুন অনেক অথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর সব কথা মেনে নিলেও জন্তুদের মতোই যে গাছের চেতনা আছে, এ-কথা স্বীকার করবার কোনো কারণ নেই। গাছের নার্ভ বা মগজের মতো কোনো দেহাংশ আছে ব'লে কখনো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। লজ্জাবতী লতা যে সাড়া দেয় হয়তো তা সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে, জ্ঞানত সে ব্যথা অনুভব করে বা শ্রান্তিবোধ করে এরূপ কোনো প্রমাণ নেই। সজীব প্রাণীমাত্রেরই মনন-শক্তি আছে, আমরা এখনো একথা স্বীকার করতে পারি না।

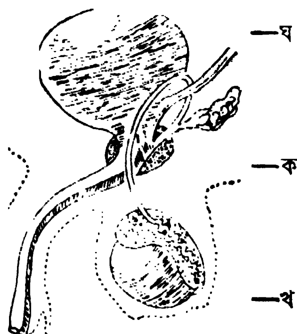
———

প্রজনন

জীবকোষ মাত্রই অমর। একটিমাত্র ব্যাকটিরিয়ামকে যদি যথেষ্ট খাদ্য ও উপযোগী আবহাওয়ার মধ্যে ছেড়ে রাখা যায় তবে সে ক্রমাগতই সংখ্যায় বাড়তে থাকে। জীবকোষ দিয়ে আমাদের শরীর গঠিত; জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, জীবেরাও তাহলে কেন অমর নয়। বহুকোষী জীবের জীবকোষ কি তাহলে অন্য রকম, তাদের বাড়বার বা বেঁচে থাকার কি তাহলে সীমা আছে তা নয়; প্রত্যেক জীবকোষেরই নিজেকে ভাগ করে ক্রমাগত বেড়ে যাবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু বহু জীবকোষ যখন একত্রে মিলে একটা ভিন্ন জীবদেহ গড়ে তোলে তখন তাদের সম্মিলিত জীবন চালনার জন্য নানান জটিল অবয়ব ও যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। সমবায় প্রণালীতে জীবনযাত্রা তখন চলে। অসুস্থতা, জরা বা মৃত্যুর কারণ ঘটে তখনই যখন সহযোগের অভাব ঘটে, সমবায়ের কোনো এক কেন্দ্রে কিছু গলদ হয়। হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে রুগীর মৃত্যুর পরও সেই হৃদ্‌যন্ত্রের এক অংশ নিয়ে ল্যাবরেটরিতে রেখে দেখা গিয়েছে তার জীবকোষগুলিকে অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা যায়। তার থেকে প্রমাণ হয়, হৃদ্‌যন্ত্রে ব্যক্তিগত জীবকোষগুলির বার্ধক্য বা মৃত্যুর কারণে তা বন্ধ হয়নি—সমবেত জীবনযাত্রায় কোনো ব্যাঘাত ঘটেছিল।

প্রজনন

প্রত্যেক জীবকোষ ব্যষ্টিগতভাবে অজর-অমর হোলেও বহুকোষী জীবমাত্রেরই মৃত্যু যে অনিবার্য এ-কথা আমরা সুনিশ্চিত জানি। তার কারণ, সমবেত কলেবর-বন্ধনের প্রকৃষ্ট উপায় এখনো পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু কোনো প্রাণীই মরতে চায় না। সশরীরে নিজেকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না ব'লে অমর হবার অভিনব উপায় সে উদ্ভাবন করেছে। শরীরের বিশেষ কয়েকটি সেলের উপর ভার দিয়েছে নতুন করে তারই অনুরূপ আরো জীব গড়ে তোলবার। এ যেন নিজের শরীরের অংশ থেকে গড়া সন্তান-সন্ততির ভিতর দিয়ে নিজেকে অমর করার প্রয়াস।



৩০. পুরুষ-জননেন্দ্রিয়

ক. প্রস্টেট্ গ্ল্যাণ্ড

খ. টেসটিস বা শুক্রাশয়

গ. ইউরেথ্রা বা মূত্রনালি

ঘ. ব্লাডার বা মূত্র-থলি

অ্যামিবা প্রভৃতি খুব নিম্নশ্রেণীর এককোষী জীবদের প্রজনন অতি সহজ উপায়ে হয় আগে বলা হয়েছে। তাদের স্ত্রী-পুরুষভেদ তো দূরের কথা দেহ-কোষ ও জননকোষের মধ্যেও কোনো প্রভেদ দেখা যায় না।

তারা বংশবৃদ্ধি ক'রে নিজেকে কেবল দু-ভাগ করে। এই সহজ উপায়ে বিভাজন থেকে শুরু ক'রে স্ত্রী-পুরুষ মিলন-ঘটিত জটিল প্রজনন-প্রণালী পর্যন্ত বহুবিধ মধ্যবর্তী প্রণালী দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয়, প্রকৃতি যেন বংশবৃদ্ধির প্রণালী নিয়ে ক্রমাগত অসংখ্য পরীক্ষা করে চলেছে, কিছুতেই সন্তোষজনক প্রকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার করতে পারছে না।

সমান দু-ভাগ হওয়া ছাড়াও সেক্স-বিযুক্ত বিভাজনের আরো রকমারি প্রণালী লক্ষ্য হয়। কয়েক রকম জীব আছে যাদের সেলে অনেকগুলি কোষকেন্দ্র থাকে। ভাগ হবার সময় কোষকেন্দ্রগুলি প্রত্যেকটি আলাদা হয়ে গিয়ে অনেকগুলি সেল প্রস্তুত করে। একটি থেকে দুটিমাত্র সেল না হয়ে অনেকগুলি সেল একসঙ্গে তৈরি হয়। আর-কয়েকটি নিম্নস্তরের জীব তাদের দেহকোষ থেকে মাঝে-মাঝে ক্ষুদ্রকায় কুঁড়ির মতো বাচ্ছা সেল (bud উৎপন্ন করে। দেহকোষের কোনো পরিবর্তন হয় না, তার আকার যেমন তেমনই থেকে যায়।

মস (moss), ফার্ণ (fern), ছাতা (fungus) প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায় তাদের শরীর থেকে কয়েকটি সেল তফাত হয়ে গিয়ে 'স্পোর' (spore) বীজাণুতে পরিণত হয় এইগুলি দেখতে ছোটো বীজের মতো, কিন্তু বীজ যে-উপায়ে জন্মায় এদের উৎপত্তি অত জটিল নয়।

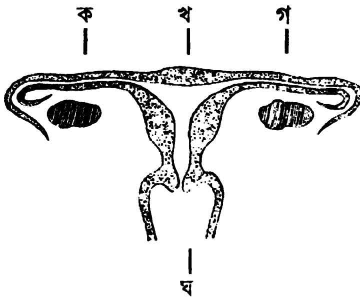
উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ এবং সংগম-ঘটিত বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকলেও তাদের অনেকেই সেক্স-সম্পর্ক-বিবর্জিত

বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা একেবারে হারায়নি দেখা যায়। আমরা সেই ক্ষমতা ব্যবহার করি যখন কোনো গাছের ডাল কেটে কলম লাগিয়ে নতুন গাছ তৈরি করি।

সেক্স-ঘটিত বংশবৃদ্ধির মূল ঘটনা হচ্ছে : উচ্চশ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ জাতিভেদের ব্যবস্থা ; পুরুষের ক্ষুদ্র জার্ম-সেল ও স্ত্রী-দেহাভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত বড়ো জার্ম-সেল প্রস্তুত হওয়া ; এবং এই দুই জার্ম-সেলের মিলে-মিশে-যাওয়া থেকে একটি নতুন জীব গড়ে ওঠা। বংশবৃদ্ধির এই প্রণালী উচ্চশ্রেণীর জীবে নানান কৌশল ও নিপুণতার চরম সীমায় পৌঁচেছে বটে কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও তার একটু সূত্রপাত দেখা যায়। সেক্সের কোনো লক্ষণ নেই অথচ দুটো দেহকোষ না মিশলে বিভাজন শুরু হয় না, এরকম উদাহরণ অনেক আছে।

পুরুষদের প্রধান জননেন্দ্রিয় শুক্রাশয় (testes)। এর ভিতর পাশাপাশি দুটি বীচির মতো গ্ল্যাণ্ড আছে। গ্ল্যাণ্ডের ভিতরকার স্তরের সেলগুলির কাজ হচ্ছে ক্রমাগত ভাগ হয়ে অসংখ্য নতুন সেল তৈরি করা। সেগুলি দেখতে ব্যাঙাচির মতো কিন্তু এত ছোটো যে, অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখা যায় না। এই সেলগুলি জননকোষ (sperms), অর্থাৎ পুরুষ-জার্মসেল। এরা শুক্রাশয়ের গ্ল্যাণ্ড দুটির ভিতর যথেচ্ছ সন্তরণ করে বেড়ায়। শুক্রাশয়ের সঙ্গে দুটি সরু নল দিয়ে মূত্র-নালির (urethra) যোগ আছে। প্রয়োজনের সময় স্পার্মসেলগুলি নল বেয়ে ইউরেথ্রার ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে।

মেয়েদের শরীরে অন্যরকম ব্যবস্থা। তাদের প্রধান জননেন্দ্রিয় ওভারিদ্বয় (ovaries)। তল পেটের ভিতর ছোট্ট দুটো গ্ল্যাণ্ড। তাদের ভিতর নির্দিষ্ট সময়ে (পুরুষদের মতো সব সময়ে নয়) একটি ক'রে (পুরুষদের মতো অসংখ্য নয়) ডিম্বকোষ অর্থাৎ স্ত্রী-জার্মসেল প্রস্তুত হয়। মেয়েদের ডিম্বকোষ পুরুষদের জনন-কোষের তুলনায় অনেক বড়ো। ওভারির ভিতর ডিম্বকোষ তৈরি হয়ে পূর্ণতা লাভ করলেই তা নলের ভিতর দিয়ে জরায়ুতে এসে নামে। জরায়ু খুব শক্ত রবারের মতো চামড়ার থলে, সাধারণ অবস্থায় ৩″ মাত্র লম্বা— প্রয়োজনমতো যথেচ্ছ বড়ো হোতে পারে।

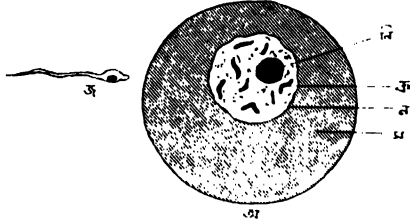


৩১. স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়

ক. ডিম্বনালি খ. ইউটেরাস বা জরায়ু
গ. ওভারি বা ডিম্বগ্ল্যাণ্ড ঘ. যোনি

স্ত্রী-পুরুষের সংগমকালে পুরুষের অসংখ্য স্পার্মসেল স্ত্রী-যোনি দিয়ে প্রবেশ ক'রে জরায়ুর ভিতর ঢোকে। সেখানে স্ত্রীর ডিম্ব-কোষ প্রস্তুত থাকে এদের অভ্যর্থনার জন্য। স্পার্মসেলগুলি জরায়ুতে প্রবেশ করেই লেজ নেড়ে সাঁতার কেটে ছুটে আসে ডিম্বকোষের দিকে। এদের মধ্যে প্রথম যেটি তাকে স্পর্শ করতে পারে তারই হয় জয়, তাকেই দেয় সে ভিতরে ঢুকতে।

ঢোকামাত্র ডিম্ব-কোষের বাইরেকার পর্দার এমন পরিবর্তন ঘটে যে, অন্য পুরুষকোষগুলি আর ঢুকতে পায় না। ডিম্বকোষের মধ্যে ঢোকবার সময় স্পার্মসেল লেজটি খসিয়ে যায় বাইরে। সে তার গন্তব্য-স্থানে পৌঁছে গেছে, সাঁতার কেটে ছোটাছুটি করার আর তার দরকার নেই।



৩২. স্ত্রী ও পুরুষ জার্মসেল

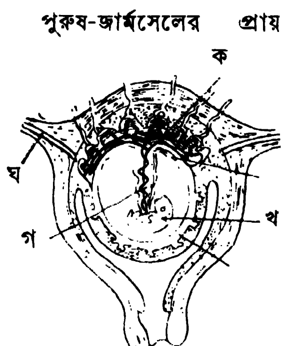
অ. স্ত্রী-ডিম্বকোষ	জ. পুরুষের স্পার্মসেল
নি. কোষকেন্দ্রিকা	ক. ক্রোমোসোম
ন. কোষকেন্দ্র	স. সাইটোপ্লাজম

মানুষের বেলায় প্রতিমাসে নির্দিষ্ট দিনে একটি করে ডিম্বকোষ স্ত্রী-লোকের ওভারিতে তৈরি হয়ে জরায়ুর মধ্যে স্পার্মসেলের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। কোনো জন্তুর তিন মাস, কোনো জন্তুর ছ' মাস, কারো বা বৎসরান্তে একবার ডিম্বকোষ জন্মায়। যদি কোনো কারণে সেই সময় পুরুষ-স্পার্মসেলের সঙ্গে মিলন না হয় তবে দু-চার দিনের মধ্যেই স্ত্রী-ডিম্বকোষ শুকিয়ে মরে যায়। আবার যথা-ঋতুতে আর-একটি প্রস্তুত হয়।

পুরুষ ও স্ত্রী-সেলের মিলনের পরমুহূর্ত থেকে ডিম্বকোষের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এতক্ষণ সে নির্জীব

অবস্থায় ছিল, এখন তার ভিতরে কাজের ভিড় বেধে যায়, সে মহা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

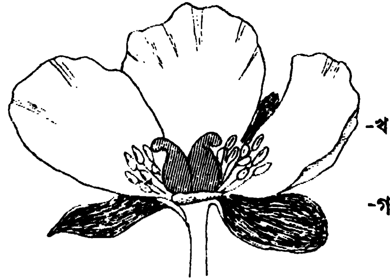
পুরুষ-জার্মসেলের প্রায় সবটাই কোষকেন্দ্র, তাতে সাইটোপ্ল্যাজম নেই বললেই হয়। স্ত্রী-জার্মসেলের মধ্যে ঢোকবার পর তার কোষকেন্দ্র আরো বড়ো হোতে থাকে এবং খানিকটা বড়ো হয়ে স্ত্রী-জার্ম-সেলের কোষকেন্দ্রের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। প্রথমেই, অর্থাৎ পুং-জার্মসেল তার ভিতর প্রবেশ করার পূর্বেই, সে তাড়াতাড়ি সাধারণ প্রণালীতে



৩৩. জরায়ুর ভিতর ভ্রূণ
ক. প্ল্যাসেণ্টা, খ. ভ্রূণ
গ. নাড়ী, ঘ. ডিম্বনালি

দু-একবার ভাগ হয়ে নেয়। সমান ভাবে ভাগ হয় না; একটি করে বাচ্ছা-সেল নিজের শরীর থেকে বের করে দেয়। এগুলিকে পোলার বডি (polar body) বলে। প্রথম পোলার বডি নিজেকে ভাগ ক'রে দুটো হয়। শেষেরটি এত নিস্তেজ যে, সে আর ভাগ হোতে পারে না। তিনটি পোলার বডিই খানিক বাদে মরে যায়, এরা কোনো কাজে লাগে না। এদের তৈরি করার একমাত্র উদ্দেশ্য মাতৃকোষ থেকে অর্ধেক পরিমাণ ক্রোমোসোম-বস্তু বের করে দেওয়া। পুং ও স্ত্রী-জার্মসেল মিলনের সময় উভয়েরই কোষকেন্দ্রে নির্দিষ্ট সংখ্যার

অর্ধেক মাত্র ক্রোমোসোম বর্তমান থাকে। ঐ দুটির মিলনের পর জাতিগত নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হয়। তারপর যা কিছু ঘটে সাধারণ বিভাজনের পর্যায় অনুসারে। একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে ক্রমাগত ভাগ হয়ে সেল বাড়তে থাকে। এই রকম ভাগ হবার প্রণালীর বিষয় পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তিন সপ্তাহের মধ্যে ডিম্বকোষ সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে এত বড়ো হয়ে যায় যে, ভ্রূণ ব'লে তখন থেকেই তাকে চিনতে পারা যায়। মানুষের বেলায় শরীরের প্রায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। তখনো কিন্তু সমস্ত ভ্রূণটা ¼" ইঞ্চির বেশি বড়ো হয়নি। দু-মাস পরে পুরো ১" ইঞ্চি হয়। তখন থেকে তাকে চিনতে পারা যায় মানুষের ভ্রূণ ব'লে। আরো সাত মাস লাগে পুরোপুরি শিশুর মতো হোতে। ন' মাস পর মায়ের জরায়ুর মধ্যে আর থাকা চলে না, শিশুর জন্ম হয়।



৩৪. উচ্চশ্রেণীর গাছের জননেন্দ্রিয়
ক. স্ট্যামেন, খ. পিস্টিল, গ. ওভারি

গাছগাছড়া যে-উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে তার সঙ্গে উপরোক্ত প্রণালীর মূলগত পার্থক্য নেই। তাদের জননেন্দ্রিয় অন্য রকম হোলেও জননক্রিয়া-প্রণালী একই ধরনের। তারাও বিশেষ

কয়েকটি সেলের উপর ভার দিয়েছে এই কাজটির জন্য। গাছের সমস্ত জননেন্দ্রিয় ফুলের মধ্যে অবস্থিত। উচ্চশ্রেণীর গাছমাত্রেরই স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই গাছের একই ফুলের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ইন্দ্রিয় দু-ই পাশাপাশি থাকে। ফুলের পুরুষ-জননেন্দ্রিয় হচ্ছে স্ট্যামেন (stamen), সরু ডাঁটার উপর একটি ছোট্ট পুঁটলি যার ভিতর পাউডারের মতো গুঁড়া ভরা। পাউডারের মতো জিনিসটা হোলো রেণু—প্রত্যেক রেণুকণা একটি পুরুষ জার্ম-সেল।

পিষ্টিল (pistil) ফুলের স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়, তার তিনটি মোটামুটি অংশ: (১) কমণ্ডলুর মতো দেখতে ওভারি, যার ভিতর বীজ জন্মায়, (২) তার থেকে একটা ডাঁটা উঠেছে, স্টাইল (style), (৩) যার মাথায় চ্যাপটা ঠুলির মতো স্টিগমা (stigma)। স্টিগমার উপরটা ভিজে চটচটে থাকে।

বাতাসে উড়ে এসেই হোক বা মৌমাছির পায়ের রোঁয়ায় লেগেই হোক রেণুকণা যখন স্টিগমার উপর এসে পড়ে তখন তার চটচটে গায়ে সে আটকে লেগে থাকে। এর মধ্যে কোনো-একটি রেণুকণা সুতোর মতো লম্বা হয়ে তার শুঁড় চালিয়ে দেয় নিচে ওভারির ভিতর। সেখানে স্ত্রী-ডিম্বকোষ তৈরি থাকে। তার সঙ্গে রেণুকণা মিলে গিয়ে, যেমন জন্তুদের বেলায় শিশু গড়ে ওঠে, তেমনি গাছের ওভারির মধ্যে বীজ জন্মায়। প্রত্যেক বীজের মধ্যে একটি ছোট্ট চারাগাছ লুকানো থাকে, সরস মাটিতে পড়লে বীজের খোলস ফাটিয়ে সে মাথা জাগিয়ে ওঠে এবং

বাড়তে বাড়তে ক্রমশ তার পিতামাতার মতোই বড়ো গাছ হয়ে ওঠে।

জননপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ মোটামুটিভাবে দেওয়া গেল। এর ভিতর লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে :

(১) নিম্নস্তরের গাছ বা জন্তুদের বংশবৃদ্ধি সাধারণ বিভাজন-প্রণালীতে কেবলমাত্র ভাগ হয়ে হয়।

(২) উচ্চস্তরের জীবমাত্রেরই স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে। দুজনের সংগমে তবে সন্তান জন্মায়।

(৩) সাধারণ দেহকোষ এই জননক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট নয়। বিশেষ অঙ্গের বিশেষ কয়েকটিমাত্র সেল এই কাজে ব্রতী। তাদের সেইজন্য জননকোষ বা জার্ম-সেল নাম দেওয়া হয়।

(৪) পুরুষের একটি এবং স্ত্রীর একটি—এই দুটিমাত্র জনন-কোষের মিলনে নূতন প্রাণীর সৃষ্টি হয়। দু-দিক থেকে—দুটি জার্ম সেল থেকে—শিশুর উৎপত্তি, সেইজন্য সে তাদের অর্থাৎ পিতামাতার দুজনের কাছ থেকেই সমানভাগে উত্তরাধিকার পায়। জনকজননী নিজেদের শরীর-মনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য একটিমাত্র জননকোষের মধ্যে নিহিত ক'রে দান করে সন্তানকে। কী ক'রে দৃষ্টির অগোচর এতটুকু একটি জননকোষের মধ্যে এতখানি এবং এত রকমের ভাবী সম্ভাবনা ভরা থাকে তার বিষয় পরে আলোচনা করব।

জীবের বংশানুক্রম

ঘরে ছেলেপিলে জন্মাবামাত্র মেয়েমহলে হুল্লোড় বেধে যায় নবজাত শিশু কার মতো দেখতে হোলো। বাপের মতো টিকোলো নাক, না মায়ের মতো ডেবা-ডেবা চোখ, তা নিয়ে পিসিমা দিদিমায় তুমুল তর্ক বেধে যায়। এর থেকে আর-কিছু না হোক, এইটে প্রমাণ হয় যে, আমরা সকলেই ধরে নিয়ে থাকি জনকজনয়িত্রীর সঙ্গে সন্তানসন্ততির ঘনিষ্ঠ-সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কেন এমন সাদৃশ্য থাকবে, তার কারণ কী, কোনো সাদৃশ্য না থাকলেই বা দোষ কী, সে-বিষয় সন্তোষজনক জবাব পাওয়া শক্ত।

বংশানুক্রমিক সাদৃশ্য ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। সব প্রথমে বোধ হয় ইংলণ্ডে ড্যালটনই (Dalton) এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেন কতকগুলি বংশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ ক'রে। পুরুষানুক্রমিক নাক, মুখ, চোখ, প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ-জোখ তিনি মিলিয়ে দেখেন। এ-রকম মাপ তুলনা করে দেখে, বংশানুক্রমের কোনো নিয়মে পৌঁছানো যায় কি না পরীক্ষা করা তাঁর ইচ্ছা ছিল। ড্যালটন প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের এ-রকম চেষ্টাসত্ত্বেও গত শতাব্দীতে বংশানুক্রম সম্বন্ধে জ্ঞান নিতান্ত ভাসা-ভাসা ছিল। তথ্য অনেক সংগ্রহ হয়েছিল

বটে কিন্তু ভিতরকার রহস্যের সন্ধান তখনো মেলেনি। জীবতত্ত্ববিদেরা এই বিষয় জানবার জন্য যখন বিশেষ চেষ্টা করেছেন অথচ ঠিক করে কিছুই ধরতে পারছেন না তখন দুটি বড়ো রকমের আবিষ্কারের ফলে অনিশ্চয়তার আবছায়া অনেকটা ঘুচে গেল।

অণুবীক্ষণের ইতিমধ্যে খুব উন্নতি হয়েছে। জার্মানিতে ভাইসমান (Weismann) অণুবীক্ষণ দিয়ে সেলের ভিতরে দৃষ্টি চালালেন। সেলের ভিতরকার যত সূক্ষ্ম কলকবজা আছে একে-একে তাদের সব সন্ধান পেতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, কোষ-কেন্দ্রের মধ্যে দড়ির মতো পাকানো খানিকটা ঘন পদার্থ আছে। সেল যখন বিভক্ত হয় তখন সেটা আর জট পাকানো থাকে না, বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐ ঘন পদার্থ কোষকেন্দ্রের দুই মেরুতে জোড়ায়-জোড়ায় দাঁড়িয়ে যায়; কখনো দড়ির মতো, কখনো কাঠির মতো, কখনো আবার ফুটকির মতো। সেলের এই পদার্থগুলির নাম দিলেন ক্রোমোসোম। মানুষের শরীরের যে-কোনো অংশের সেল অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে, দেখতে পাব তার ভিতরে ৪৮টি ক্রোমো-সোম আছে। একই জাতীয় জীবের মধ্যে ক্রোমোসোমের সংখ্যার কখনো ব্যতিক্রম হয় না। জাতিভেদে সংখ্যার তারতম্য হয় বটে কিন্তু প্রত্যেক জাতির বিশেষ একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। নিচে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল :

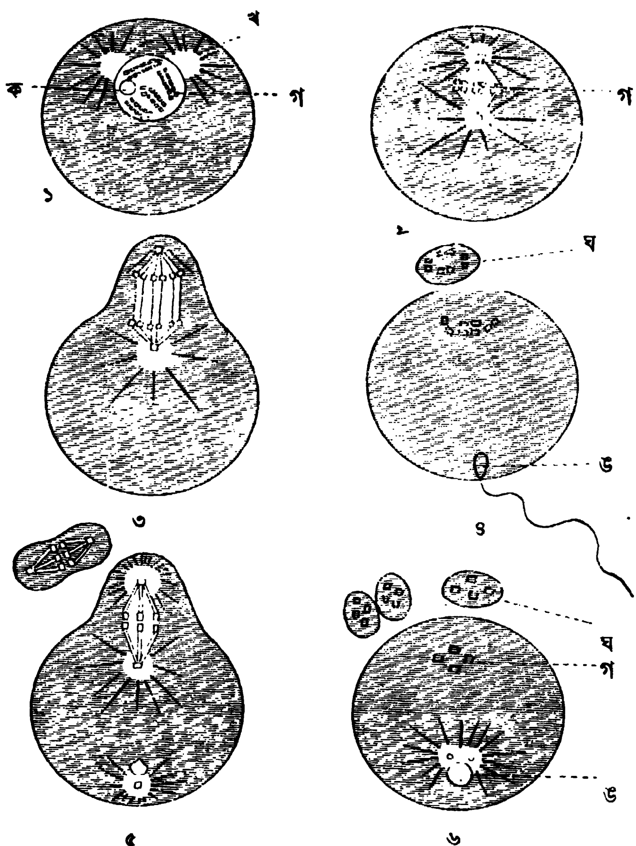
উদ্ভিদ	জন্তু
বাঁধাকপি—১৮	কুকুর—২২
ভুট্টা—২০	ঘোড়া—৩৮

উদ্ভিদ	জন্তু
ধান—২৪	গোরু—১৬
তামাক—৪৮	বাঁদর—৫৪
গম—৪২	মানুষ—৪৮

সাধারণভাবে সেল নিজেকে যখন ভাগ করে, বিভাজনের অনতিপূর্বে ক্রোমোসোমগুলি তার ভিতর ডবল হয়ে যায়। ভাগের সময় অর্ধেকগুলি একটি বাচ্ছা সেলে ও বাকি অর্ধেক অন্যটিতে চলে যায়। বিভাজনের পূর্বে ডবল হয়ে যাওয়া ও পরে সমান দু-ভাগে বিভক্ত হওয়ার ফলে বাচ্ছা সেলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ঠিক থেকে যায়। জাতিগত নির্দিষ্ট সংখ্যার সেজন্য কখনো কম-বেশি হয় না। কাজেই মাতৃকোষে যত ক্রোমোসোম থাকে সন্তান-কোষেও ঠিক ততগুলিই থাকে।

স্ত্রী-পুরুষ সংগমঘটিত বিভাজনের প্রণালীতেও ক্রোমোসোমের সংখ্যা ঠিক থাকে, তবে অর্ধেক আসে পৈতৃক জননকোষ থেকে, বাকি অর্ধেক মাতৃক ডিম্বকোষ থেকে।

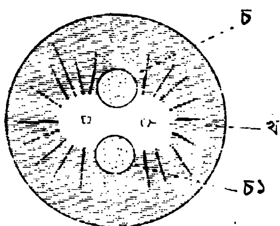
ভাইসমান অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখে চাক্ষুষ প্রমাণ পেলেন যে, বাপ-মা দুজনের কাছ থেকে শিশু সমান ওজনে উত্তরাধিকার পায়। এর থেকে আরো জানা গেল যে, ভাবী শিশুর যাবতীয় উত্তরাধিকার ক্রোমোসোমের মধ্যেই নিশ্চয় নিহিত থাকে। জনকজননী সন্তানকে যা-কিছু দিতে চায় এই ক্রোমোসোমের ভিতর দিয়েই দিতে হয়। ভালো অণুবীক্ষণ দিয়ে



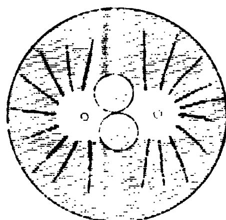
৩৫. (ক) মিথুনঘটিত বিভাজন

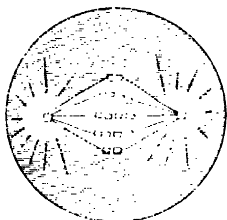
১.২.৩. ডিম্বকোষ প্রস্তুত হচ্ছে পুং-জার্মসেলের সঙ্গে মিলনের জন্য ৪. পুং-জার্মসেল ডিম্বকোষে প্রবেশ করছে ৫. ঢোকার পর তার লেজ খসে গেছে ৬. ইতিমধ্যে ডিম্বকোষ সাধারণ বিভাজন-প্রণালীতে ৩টা ছোটো বাচ্চা-সেল (polar bodies) প্রস্তুত করেছে।

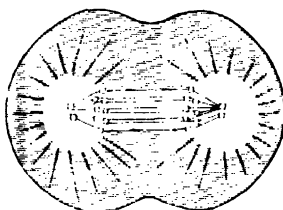
ক. কোষকেন্দ্রিকা খ. সেণ্ট্রোসোম গ. ক্রোমোসোম ঘ. পোলার বডি ঙ. পুং-জার্মসেল

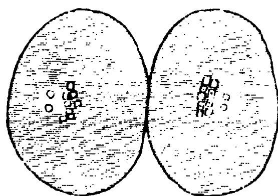


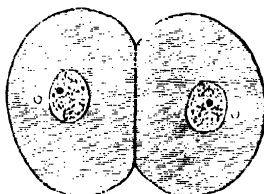
৭


৮


৯


১০


১১


১২

৩৫. (খ) মিথুনঘটিত বিভাজন

৭. ৮. পুং ও স্ত্রী-জার্মসেলের কোষকেন্দ্র পরস্পর কাছাকাছি আসছে ৯. ১০. তারা মিশে গিয়ে আবার ভাগ হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ১১. ১২. ভাগ হয়ে দুটি সেলের উৎপত্তি। এর পর এই রকম ভাগ হোতে হোতে ভ্রূণ গড়ে উঠবে। নকশাগুলিতে ক্রোমোসোমের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

খ. সেণ্ট্রোসোম চ. $চ_১$. পুং ও স্ত্রী-কোষকেন্দ্র

দেখলে আবার দেখা যায় যে, প্রত্যেক ক্রোমোসোমেরও বিন্দু বিন্দু ভাগ আছে। সেই দেখে ভাইসমান্ অনুমান করলেন যে, জীবের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি, শরীরের প্রত্যেক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য ক্রোমোসোমের এই বিন্দুগুলি দায়ী। বিন্দুরও মধ্যে হয়তো থাকে অণুবিন্দু যা অণুবীক্ষণেও ধরা পড়ে না। কোনো-একটি লোকের চুল কালো না কটা হবে, নাক টিকোলো না খেঁদা হবে, স্থির করে ক্রোমোসোমের মধ্যেকার কোনো অণুবিন্দু। এই হোলো ভাইসমানের মতবাদের সারমর্ম।

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে বংশানুক্রম সম্বন্ধে আর-একটি আবিষ্কার এর চেয়ে আরো বেশ পরিষ্কার করে সব বুঝিয়ে দিল। প্রায় একশ' বছর হয়ে গেল অষ্ট্রিয়ার একটি নগণ্য শহরের খ্রীস্টানী মঠে মেণ্ডেল (Mendel) নামে একজন পাদ্রী ছিলেন। তিনি মঠের পিছনে ছোট্ট একটুখানি বাগানে কয়েকটা মটরশুঁটির গাছ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। সেই পরীক্ষার ফল ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে কোনো বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তখনকার বিজ্ঞান-জগতে মেণ্ডেলের পরীক্ষা নিয়ে কোনো আলোচনাই ওঠেনি। তাঁর কাজ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের অবজ্ঞা তাঁকে খুবই পীড়া দেয় এবং তার ফলে শীঘ্রই তাঁর মৃত্যু হয়। মেণ্ডেলের সেই প্রবন্ধ তার পরেও বহুকাল চাপা পড়ে ছিল। অতি আশ্চর্যের বিষয়, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে তিনজন বিভিন্ন বিজ্ঞানী মেণ্ডেলের প্রবন্ধ একই সময় খুঁজে পান।

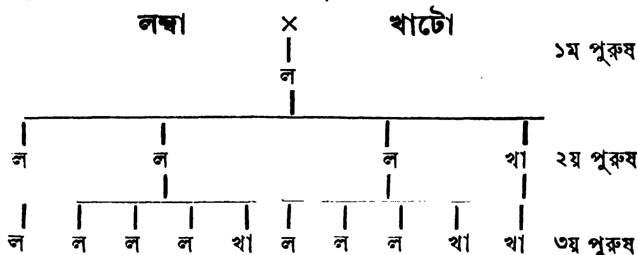
তাঁরা তৎক্ষণাৎ এর মূল্য উপলব্ধি করেন এবং মেণ্ডেলের পথ অনুসরণ ক'রে নানারকম জীবজন্তু নিয়ে পরীক্ষা শুরু করে দেন। সেই সব পরীক্ষার ফল মেণ্ডেলের মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ রাখল না। মেণ্ডেলের এই আবিষ্কার, যার চলতি নাম হয়ে গেছে মেণ্ডেলিজম, কী ব্যাপার এখন বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

মেণ্ডেলিজমের গোড়াকার কথা হোলো জৈব-ব্যক্তিত্ব কতকগুলি গুণের সমবায়মাত্র। এই গুণগুলি (যাকে মেণ্ডেলিয়ান পরিভাষায় unit character বা factor বলা হয়) প্রাণীর শরীর ও মনের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়ে তার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু গুণগুলি তার নিজস্ব সম্পত্তি নয়, এগুলি সে তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পায়। মেণ্ডেলিয়ানরা প্রত্যেক unit characterকে অখণ্ডনীয়, অপরিবর্তনীয় ব'লে মনে করেন ও এই ব্যক্তিগত বিশিষ্ট গুণগুলির অনন্ত সত্তা আছে তারও প্রমাণের চেষ্টা করেন।

জার্ম-সেলের মধ্যেকার ক্রোমোসোম মেণ্ডেলিয়ান factor-গুলি প্রকাশের ভার নিয়েছে। ক্রোমোসোম ক্ষুদ্র হোলেও তারও ভাগ আছে, অসংখ্য বিন্দু সমাবেশে এক একটি ক্রোমোসোম গঠিত। ক্রোমোসোমের প্রত্যেক অংশকণা এক একটি পৃথক মেণ্ডেলিয়ান গুণ-প্রকাশের জন্য দায়ী। বংশানুক্রমের আদিম আধার ক্রোমোসোমের এই ক্ষুদ্রাংশগুলিকে আধুনিক পরিভাষায় জীন (gene) বলে।

মেণ্ডেল কড়াইশুঁটির গাছ নিয়ে তাঁর বাগানের এক কোণে

পরীক্ষা শুরু করেন। পাঁচরকম বীজ লাগিয়ে দেখেন কোনো জাতের লতা লম্বা, কোনোটা খাটো ; কারো শুঁটি পাকলে হলদে হয়, কারো সবুজই থেকে যায়; জাতবিশেষে ফুলের রং নানারকম হয়। তিনি প্রথম পরীক্ষা করলেন লম্বা জাতের সঙ্গে খাটো জাতের সংমিশ্রণ করে। লম্বা লতার ফুল থেকে রেণু নিয়ে খাটো লতার ফুলের পিষ্টিলে লাগিয়ে দিলেন। সেই ফুল থেকে যে-বীজ হোলো পৃথক করে তুলে পরের বছর পুঁতে দেখলেন, সব চারাই লম্বা জাতের হোলো। এদের বীজ আবার পোঁতা হোলে তৃতীয় বছরে তিন ভাগ লম্বা ও একভাগ খাটো গাছ জন্মাল। চতুর্থ বছরে খাটো গাছের বীজ থেকে কেবল খাটো কিন্তু লম্বা গাছ থেকে পুনরায় তিন ভাগ লম্বা ও এক ভাগ খাটো গাছ জন্মাতে দেখা গেল। মেণ্ডেল-বর্ণিত এই ঘটনাটি নিম্নলিখিতভাবে ছক কেটে দেখানো যেতে পারে বোঝবার স্থবিধার জন্য :



কড়াইশুঁটি গাছের অন্য সব গুণ (যেমন শুঁটির রং, ফুলের রং ইত্যাদি) নিয়ে পরীক্ষা ক'রে মেণ্ডেল ঠিক ঐ একই রকম বংশানুক্রম দেখলেন। এর থেকে উনি সাব্যস্ত করলেন যে, দুটি মিশ্রণবিমুখ

গুণের মধ্যে একটির জোর বেশি। কড়াইশুঁটির মধ্যে প্রবল (dominant) গুণ হচ্ছে—দৈর্ঘ্য, শুঁটির হলদে রং, ফুলের লাল রং। খর্বতা, শুঁটির সবুজ রং, এবং ফুলের বেগুনি রংকে দুর্বল (recessive) গুণ বলা যেতে পারে। পৃথক দুটি গুণ মিশ্রণের ফলে দ্বিতীয় পুরুষের সন্তানদের তিন ভাগ বাইরে থেকে প্রবল গুণান্বিত দেখালেও কেবল এক ভাগই খাঁটি প্রবল, অন্য দুভাগ নিশ্চয়ই মিশ্র প্রকৃতির ধরে নেওয়া যেতে পারে। যে দুটি গুণ মেশানো হয় তাদের যদি ক ও খ সংজ্ঞা দেওয়া যায় তাহলে সংমিশ্রণের ফল এভাবে লেখা যেতে পারে :

$$ক + খ = ক^{২} + ২ কখ + খ^{২} *$$

এদের মধ্যে $ক^{২}$ ও $খ^{২}$-এর বংশধরেরা বরাবর $ক^{২}$ ও $খ^{২}$ থেকে যায়; কিন্তু কখ-দের পরস্পর মিলনের ফলে পুনরায় $ক^{২} + ২ কখ + খ^{২}$ অনুসারে সন্তান হয়।

এই হিসাবমতো ভাগ হবার কারণ কী। মেণ্ডেল অনুমান করলেন যে, এর সঙ্গে নিশ্চয়ই জার্মসেলের কোনোরকম যোগাযোগ আছে। লম্বা কড়াইশুঁটির জার্মসেলে এমন একটা কিছু আছে যাতে তার বীজ থেকে উৎপন্ন লতাকে লম্বা করে তোলে। জার্মসেলের মধ্যে সেই পদার্থটি কী, কিভাবে তা কাজ করে, সে-বিষয়ে মেণ্ডেল বিশেষ কিছু কিন্তু জানতে পারেননি। ভাইসমানের পরবর্তীকালের আবিষ্কার এর ভিতরকার রহস্য আমাদের বেশ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে। মেণ্ডেল কেবল

* $ক^{2}$ লেখবার অর্থ, জনক ও জননী উভয়ের কাছ থেকেই এরা ক-গুণ পেয়েছে। কাজেই দ্বিগুণ অনুপাতে এই গুণ তাদের মধ্যে বর্তমান।

এইটুকুমাত্র অনুমান করেছিলেন যে, প্রত্যেক জীব যে-সব দৈহিক ও মানসিক গুণ নিয়ে গঠিত তার প্রত্যেকটি গুণ ফুটিয়ে তোলবার জন্য জননকোষের কোনো-একটি অংশের বিশেষ দায়িত্ব আছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুটি গুণ মিশে যখন সন্তান জন্মায়, তাদের মধ্যে দুটোই সমানে বর্তমান থাকে। প্রবল গুণটি দুর্বলটিকে চাপা দিয়ে রাখে মাত্র, সেইজন্য প্রথম পুরুষে সব সন্তানদেরই প্রবল গুণান্বিত ব'লে মনে হয়, দুর্বলগুণটি প্রকাশ পেতে পারে না। দ্বিতীয় পুরুষের সন্তানদের মধ্যে গুণ দুটি পৃথক হয়ে দেখা দেয়। যে-নিয়মে পৃথক হয় একটু আগে বলা হয়েছে।

স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে সন্তান জন্মায়। দুই না হোলে সৃষ্টি হয় না। প্রাণী-বিজ্ঞানে সেইজন্য 'দুই' সংখ্যার বিশেষ মর্যাদা। প্রাণীসৃষ্টির ভিত্তি হোলো 'দুই'-য়ে। সেইজন্যই মেণ্ডেলিয়ান বংশানুক্রমে অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম এসে পড়েছে। বংশানুক্রম ব্যাপারটাই সংখ্যা নিয়ে কারবার। তার শুরু স্ত্রী ও পুরুষ দুটির মিলন থেকে। সেই মিলনের ফলে দুটি জার্ম-সেলের ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রণ, তৎপূর্বে সেল দুটির ভিতরে কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যার ক্রোমোসোমের দ্বিগুণ হয়ে আবার অর্ধেক ভাগ হয়ে যাওয়া,—প্রভৃতি বংশবৃদ্ধির যাবতীয় প্রণালীর মধ্যেই দ্বিত্বের খেলা। মেণ্ডেল গাছ নিয়ে পরীক্ষা ক'রে যে-নিয়ম বের করেছিলেন, চেষ্টা করলে আমরা কেবল যুক্তি ও অঙ্কের সাহায্যে হয়তো ঐ নিয়মটিতে পৌছাতে পারি।

ধরা যাক, একটি গোয়ালে এক পাল গোরু আছে যার অর্ধেক-গুলো লাল আর বাকি অর্ধেক কালো। বাইরের কোনো গোরুর

সঙ্গে তাদের মিশতে দেওয়া হয় না, নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট মেশামেশি করতে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় আকস্মিকতার নিয়মানুসারে ধরা যেতে পারে একটা কালো ষাঁড় কোনোবার কালো কোনোবার লাল গোরুর সঙ্গে পালে মিশবে। তেমনি কোনো লাল ষাঁড় একবার লাল একবার কালো গোরুর সঙ্গে পালে মিশবে। তাহলে কালো গোরুর বাছুরদের মধ্যে হবে অর্ধেক কালো ও অর্ধেক দোআঁশলা। তেমনি লাল গোরুর বাছুরদের মধ্যেও হবে অর্ধেক পুরো লাল ও বাকি অর্ধেক মিশোল। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, সর্বসমেত ৪০০ বাছুর জন্মেছে তাহলে :

কালো গোরুদের ২০০ বাছুরের মধ্যে ১০০ কা² + ১০০ কা-লা
লাল „ „ „ „ ১০০কা-লা + ১০০লা²

মোট ৪০০ বাছুরের মধ্যে ১০০কা² + ২০০কা-লা + ১০০লা²
অর্থাৎ কা² + ২ কা-লা + লা²

কড়াইশুঁটির গাছ নিয়ে পরীক্ষার ফলে মেণ্ডেল ঠিক এই নিয়মেই উপনীত হয়েছিলেন।

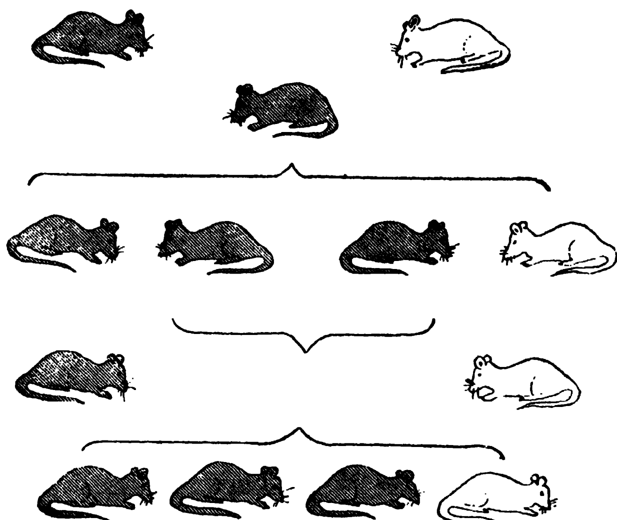
লাল ও কালো রং এই দুটো গুণ মেশালে কী হয় দেখলুম এখন যদি ঐ গোরুর পালের মধ্যে কতকগুলি সাদা গোরু এসে পড়ে তবে কী হয়। তাহলে হিসাব এই রকম দাঁড়ায় :

	কালো ষাড়	লাল ষাড়	সাদা ষাড়
কালো গোরুর বাছুর	কা²	কা-লা	কা-সা
লাল „ „	কা-লা	লা²	লা-সা
সাদা „ „	সা-কা	সা-লা	সা²

মোট—কা² + ২কা-লা + লা² + ২লা-সা + সা² + ২কা-সা

অর্থাৎ ৯টা বাছুরের মধ্যে ১টা খাঁটি সাদা, ১টা কালো, একটা লাল এবং বাকি সবগুলি দোআঁশলা।

দুই, তিন বা ততোধিক গুণ মেশালেও বংশপরম্পরায় তারা বীজগণিতের উৎপাদকের মতোই মিশ্রণবিমুখভাবে চলতে থাকে



৩৬. সাদা ইঁদুরের সঙ্গে সাধারণ মেটে রঙের ইঁদুর মেশাবার ফলাফল

দেখে মেণ্ডেল ধারণা করলেন যে, প্রত্যেক গুণের পৃথক সত্তা আছে এবং অধিকাংশ সময়েই তারা পরস্পরবিরোধী। কড়াইশুঁটির লম্বা ও খাটো গুণ যদি পৃথক সত্তাবান ও মিশ্রণবিমুখ না হোত

তবে তারা বংশানুক্রমে কখনই অ্যালজেবরার সংখ্যার মতো নিয়ম মেনে চলত না। তারা তাহলে মিশে যেত; প্রথম পুরুষ থেকেই আরম্ভ করে বরাবর মাঝারি রকমের গাছ জন্মাত। মিশে যায় এ-রকম গুণ নিশ্চয়ই অনেক আছে, তাদের বেলায় মেণ্ডেলের আইন খাটে না।

মেণ্ডেলের মতবাদ নিয়ে আলোচনার সময় একটি ভুল ধারণা হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, সে-বিষয় সাবধান হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। মেণ্ডেলের আইন কেবলমাত্র কোনো একটি বিশেষ গুণ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে নয়। আমরা যদি মনে ভাবি যে, একটা কুকুর ও একটা শেয়াল মেশালে তাদের দ্বিতীয় পুরুষের বাচ্ছাদের মধ্যে একটা শেয়াল, একটা কুকুর ও দুটা শেয়াল কুকুরের মাঝামাঝি কোনো জন্তু জন্মাবে, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই হাস্যকর ব্যাপার হবে। যে-কোনো প্রাণীর মধ্যে হাজার হাজার গুণ আছে, তারই যে-কোনো একটি গুণ সম্বন্ধে মেণ্ডেলের আইন খাটে। যেমন, একটি মেয়ে যার কটা চোখ, তার সঙ্গে যদি বিয়ে দেওয়া যায় যে-পুরুষের চোখ কালো, তবে তাদের বংশধরদের মধ্যে কটা ও কালো চোখের সংখ্যা ৩ : ১ ভাগে দেখতে পাওয়া যাবে, এ-বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু তাই ব'লে মনে করলে চলবে না, একজন নিগ্রোর সঙ্গে একটি চীনে মেয়ের বিয়ে দিলে তাদের বংশধরদের মধ্যে ৩ ভাগ নিগ্রো ও ১ ভাগ চীনে হবে।

মেণ্ডেলের আবিষ্কার অনুসরণ করে গত চল্লিশ বছর ধরে,

পৃথিবী জুড়ে বহু বিজ্ঞানী নানান পরীক্ষা করে কেবল যে এই মতবাদের সত্যতা প্রমাণ করেছেন তা নয়, আরো অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছেন। তার মধ্যে একটি বিষয় সকলেরই জানা উচিত। পূর্বে বলা হয়েছিল, এক-একটি জাতির সেলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে, ব্যক্তি অনুসারে তাদের সংখ্যার কোনো বদল হয় না, কিন্তু কথাটা যে একেবারে সর্বাঙ্গীণ সত্য, তা নয়; প্রত্যেক জাতির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের সেলের পার্থক্য আছে। স্ত্রীলোকদের শরীরের সেলে কোনো একটি ক্রোমোসোম ডবলমাত্রায় থাকে। যে বিশেষ রকমের ক্রোমোসোম পুরুষে মাত্র একটি অথচ স্ত্রীলোকে দুটি করে থাকে তাকে x-ক্রোমোসোম নাম দেওয়া হয়েছে। ডিম্বকোষে দুটি x-ক্রোমোসোম (xx) একত্রিত হোলেই তার থেকে যে ভ্রূণ জন্মায় তার মেয়েলি প্রকৃতি হয়। আর পুরুষ জন্মায় সেই ডিম্বকোষ থেকে যাতে মাত্র একটি x-ক্রোমোসোম (x) আছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সেলের মধ্যে আর একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বলা হয়েছে পুরুষদের কেবলমাত্র একটি x-ক্রোমোসোম থাকে— কিন্তু অনেক সময় তার সঙ্গে আর একটি ভিন্নাকৃতির ক্রোমোসোম যুক্ত থাকতে দেখা যায়। এর নাম y-ক্রোমোসোম। এইটি কখনো স্ত্রীলোকের সেলে পাওয়া যায় না।

জীবকোষে যত ক্রোমোসোম থাকে তার মধ্যে x ও y এই দুটি ক্রোমোসোম স্ত্রী-পুরুষ ভেদের জন্য দায়ী, তাই এই দুটিকে সেক্‌স্‌ ক্রোমোসোম (Sex chromosomes) বলা হয়।

তবে x ও y-ক্রোমোসোম দুটি কেবল যে সেক্স্ গুণেরই আধার তা নয়—এদের মধ্যে অন্যান্য গুণের জীনও (Genes) বর্তমান থাকে। তাই আমরা দেখতে পাই কতকগুলি গুণ আছে যা কেবল স্ত্রীলোকেই বর্তায়, পুরুষের মধ্যে সেই গুণগুলি কখনো দেখা যায় না। আবার পুরুষের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভালো বোঝা যাবে।

মানুষের একটা অদ্ভুত ব্যারাম হয়, তার ডাক্তারী নাম হিমোফিলিয়া (hæmophilia)। এর লক্ষণ,—শরীরের যে-কোনো অংশ থেকে রক্তস্রাব হোলে তা বন্ধ হোতে চায় না। সাধারণ মানুষের রক্ত শরীর থেকে বেরোলেই যেমন জ'মে চাপ বেঁধে যায়, এই রুগীদের তা হয় না, তাদের রক্তের দানা বাঁধবার ক্ষমতা নেই। আশ্চর্য এই যে, মেয়েদের কখনো এই রোগ হয় না। অথচ এই ব্যারাম যে-বংশে আছে তার স্ত্রীলোকেরা নিজেরা রোগমুক্ত হোলেও তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যে রোগটি তারা চালিয়ে দেয়। এইরকম গুণগুলিকে সেইজন্য সেক্স-জড়িত গুণ বলা হয়। হিমোফিলিয়া ছাড়া এই ধরনের স্ত্রৈণ গুণের আরো অনেক উদাহরণ আছে।

বংশানুক্রমের অন্ধিসন্ধি যতই আমরা জানতে পারছি, কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতি ততই সহজ হয়ে আসছে। খুব সুবিধা হচ্ছে, নতুন রকম গাছগাছড়া যারা তৈরি করতে চেষ্টা করে এবং গোরু, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি জন্তুজানোয়ারের উন্নতির জন্য যারা চেষ্টা করে,

তাদের পক্ষে। প্রত্যেক বছরেই নার্সারিওয়ালারা আমাদের কত রকম নতুন ধরনের ফুলগাছের আবিষ্কারের কথা জানিয়ে দেয়। গত অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে জন্তুজানোয়ারের উন্নতিও বড়ো কম হয়নি। মেণ্ডেলিজমের সাহায্য-ছাড়া এ-সব কিছুই সম্ভব হোত না। গাছগাছড়া ও জন্তুদের উন্নতির জন্য মেণ্ডেলিয়ান নিয়ম প্রয়োগ করেই বিজ্ঞানীরা ক্ষান্ত হননি, মানুষের সমাজেও তার পরীক্ষা করতে তাঁরা উদ্যত হয়েছেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদের সমাজের কী ক'রে ক্রমশ উন্নতি করা যায় সে-বিষয় গবেষণা করবার জন্য সুজননবিদ্যা (Eugenics) নামে বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়ে আন্দোলনের ফলে অনেক প্রগতিশীল দেশে আইন পাশ হয়েছে। তাতে, যে-সব রোগ বংশপরম্পরায় চলতে থাকে তার প্রকোপ কমাবার জন্য রুগীরা বিবাহ করলেও যাতে সন্তান না জন্মায়, গভর্নমেণ্ট থেকে তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। যতদিন এসব বিষয়ে সঠিক আমরা জানতুম না সে এক কথা ছিল। এখন আমরা যখন জানি কোন্ রোগ বা দোষগুলি বংশানুক্রমিক, কোন্‌গুলি তা নয়, তখন এ-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকা অনুচিত। সব দেশেই আইন ক'রে জন্মগত রুগ্নসন্তান জন্মাতে দেওয়া বন্ধ করা উচিত। কেবল রোগ নয়, কয়েকরকমের বুদ্ধিহীনতা, উঞ্ছবৃত্তির প্রবণতা, পাগলামি প্রভৃতি স্বভাবের দোষগুলিও বংশপরম্পরা চলতে থাকে। এই সব দুর্বলতা সমাজের বুকে রাখা কোনোক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

মানুষের মধ্যে মেণ্ডেলিয়ান বংশানুক্রমের কয়েকটি উদাহরণ

পিছনের পাতায় দেওয়া যাচ্ছে। এর দৃষ্টান্ত আমাদের ঘরে-ঘরেই আছে। এই তালিকা থেকে বোঝা যায়, বাপ-মার যদি কালো চোখ থাকে তবে ছেলেপিলেদের অধিকাংশ কালো চোখ হোলেও কখনো-কখনো কটা চোখও দেখা যাবে। কিন্তু বাপ-মা দুজনেরই যদি কটা চোখ হয় তবে সব ছেলেপিলেদের কটা চোখ হোতে বাধ্য। চুল সম্বন্ধেও তাই,—যাদের সোজা চুল তাদের ছেলেপিলে-দের কেবল সোজা চুল হয়। এর ব্যতিক্রম নেই। চোখ ও চুল সম্বন্ধেই কেবল উদাহরণ দেওয়া হোলো, কিন্তু মানুষের আরো বিস্তর গুণ মেণ্ডেলিয়ান বংশানুক্রম খতিয়ে বের করা হয়েছে।

চোখ ও চুলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে মানুষের বংশানুক্রম*

জনক বা জননী		সন্তান
কালো চোখ-কোঁকড়া চুল × কালো চোখ-কোঁকড়া চুল	=	সব ঐ অথবা ১/৪ কটা চোখ এবং ১/৪ সোজা চুল
” ” × ” -সোজা চুল	=	সব কালো চোখ (১/৪ কটাও হোতে পারে) এবং সব কিংবা অর্ধেক সোজা চুল
” -সোজা চুল × ” ”	=	সব কালো চোখ (১/৪ কটাও হোতে পারে) এবং সব সোজা চুল
” কোঁকড়া চুল × কটা চোখ-কোঁকড়া চুল	=	সব কিংবা অর্ধেক কালো চোখ; সব কিংবা ৩/৪ কোঁকড়া চুল
” ” × ” -সোজা চুল	=	সব কিংবা অর্ধেক কালো চোখ; সব কিংবা অর্ধেক কোঁকড়া চুল
” -সোজা চুল × ” ”	=	সব কিংবা অর্ধেক কালো চোখ; সব সোজা চুল
কটা চোখ-কোঁকড়া চুল × কটা চোখ-কোঁকড়া চুল	=	সব কটা চোখ; সব কিংবা ৩/৪ কোঁকড়া চুল
” ” × ” -সোজা চুল	=	” ; সব কিংবা ১/২ কোঁকড়া চুল
” -সোজা চুল × ” ”	=	” ; সব সোজা চুল

* C.B. Davenport-এর Heredity in Relation to Eugenics বই থেকে উদ্ধৃত

জীব-সমাজ

জীবের উৎপত্তি, ক্রমবিবর্তন ও বৈচিত্র্য ; তাদের শরীর-গঠন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ, আহার-সংগ্রহ ও তার থেকে শক্তি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা ; জীবকোষ, জীবকোষের বিভাজন ও বৃদ্ধি ; জীবের বংশানুক্রম প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয়ে আলোচনা করা গেছে পূর্ব কয়েক অধ্যায়ে। বিজ্ঞানীরা এর প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে এত খবর সংগ্রহ এবং এত জ্ঞান-উপার্জন করেছেন যে, সেই জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে পাঠকের কাছে ধরা একখানি ছোটো বইয়ের কাজ নয়। জীবতত্ত্বের সামান্য এক-একটি বিষয় নিয়ে সারা-জীবন চর্চা করলেও তা শেষ করা যায় না। তথ্যসংগ্রহের জন্য এমনি ক'রে খণ্ডভাবে অনুসন্ধান বা বিচার করার প্রয়োজন যেমন আছে, মাঝে-মাঝে সমগ্র ভাবে দেখাও দরকার, তা না হোলে জীবনলীলার আসল রহস্য কখনো বুঝতে পারব না। জীবনপ্রণালী টুকুরো টুকরো ক'রে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, এখন চেষ্টা করা যাক জীবজগতের সমগ্ররূপ দেখবার।

পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি হয়েছিল সম্ভবত সামান্য একবিন্দু জীবকোষ থেকে। লক্ষ-লক্ষ বছর ধ'রে ক্রমবিবর্তনের ফলে এখন

জীব-সমাজ

পৃথিবী ছেয়ে গেছে বিচিত্র উদ্ভিদ ও জন্তুজানোয়ারে। তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কখনো মধুর, কখনো নিষ্ঠুর। পরস্পরের মধ্যে এই যোগাযোগ ছাড়াও পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ, তাও কখনো অনুকূল, কখনো বিরুদ্ধ। সমবায়-অসহযোগ, অনুকূলতা-প্রতিকূলতা প্রভৃতি যে সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে জীবজগৎ গড়ে উঠেছে সে-বিষয় বিশেষভাবে চর্চা যে-বিজ্ঞান করে তাকে বলা হয় 'ইকলজী' (Ecology)।

এমন কোনো জীব নেই যে সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর ক'রে একা বাঁচতে পারে। প্রত্যেক প্রাণীর জীবন আরো পাঁচটা প্রাণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ-বিষয় জন্তুজানোয়ারের চেয়ে উদ্ভিদ তবু অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। তারা অন্যের বিনা-সাহায্যে বাতাস ও মাটি থেকে খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ ক'রে নিজেদের শরীর গড়ে তুলতে পারে।

কিন্তু খাবারের জন্য জন্তুদের নির্ভর করতে হয় অন্য জন্তুর উপর এবং শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদেরই উপর। তবে উদ্ভিদ কি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর। সে খাবার না হয় পেল মাটি ও হাওয়া থেকে, কিন্তু তার মৌমাছি না হোলে যে বীজ জন্মায় না। বীজ ছড়াবার জন্যেও যে তাকে পাখিদের সাহায্য নিতে হয়। অনেক জন্তু আছে যারা একা থাকতে ভালোবাসে, কিন্তু তাদেরও পাঁচরকম ব্যাকটিরিয়া না হোলে জীবনধারণ করা চলে না। পৃথিবীর স্বল্প পরিসরের মধ্যে হাজার-হাজার রকমের প্রাণী বাসা বেঁধেছে।

কাছাকাছি থাকতে থাকতে তাদের পরস্পরের মধ্যে নানাপ্রকার নিবিড় সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গেছে।

সমগ্র প্রাণীজগতের কথা যদি ভাবি, দেখতে পাই যে, যেখানেই প্রাণের সাড়া আছে সেখানেই উদ্ভিদ আহার্য প্রস্তুত করতে রত। নিরামিষভোজী জন্তুরা তাদের প্রস্তুত সেই খাদ্যসামগ্রী খেয়ে ফেলে, আমিষভোজী জন্তু অন্য জন্তুদের খায় এবং ব্যাকটিরিয়া উদ্ভিদ এবং জন্তু উভয়কেই ব্যবহারে লাগায়। সবুজ শাকপাতা না থাকলে পৃথিবী নিষ্প্রাণ হবে পরমুহূর্তেই। এবং ব্যাকটিরিয়া না থাকলে গাছপালা-জন্তুজানোয়ারের মৃতদেহের পুঞ্জীভূত স্তূপে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে ধরণী দু-চার দিনেই। উদ্ভিদ-জন্তু-ব্যাকটিরিয়া এই তিনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ধারণ করে রেখেছে সমগ্র প্রাণীজগৎকে।

এই বৃহৎ পটভূমি ছেড়ে যদি আরো সংকীর্ণ ক্ষেত্রে নামি তাহলে দেখতে পাই, কোনো-একটি জাতি কোনো বিশেষ স্থানে প্রাধান্য লাভ করে। কোনো-কোনো মাঠে কেবল ঘাসই জন্মায়, ছোটোনাগপুরের শুকনো পাথুরে মাটি শালবনে ছেয়ে ফেলেছে। বাংলার খাল বিল ডোবা কচুরিপানাতে ভরে গেছে। অবস্থা-বিশেষে এক-একটি জাতের উদ্ভিদ বিস্তৃতভাবে যে ছড়িয়ে পড়ে তার কারণ—উদ্ভিদের সূর্যকিরণ ও জলের উপর একান্ত নির্ভর। যে-অবস্থায় যে-জায়গায় যে-গাছ সবচেয়ে বেশি জল ও আলো সংগ্রহ করতে পারে তার প্রতিপত্তি হয় সেখানেই।

জন্তুদের সমাজ আরো জটিল। সেখানে দেখি, ছাগল, ভেড়া,

গোরু প্রভৃতি একদল নিরামিষাশী জাবরকাটা জন্তু গাছপালা ধ্বংস ক'রে জীবনধারণ করছে, আর আমিষাশী হিংস্র জন্তুরা পরস্পরকে খেয়ে নিজেদের বাঁচাচ্ছে। তার পর আছে এক জাতের পরজীবী যারা এই দু-দলকেই শোষণ করে বেঁচে থাকে। এবং সবশেষে রয়েছে সেই জীবগুলি যারা ভাগাড়ে বাস করে, তারা উদ্ভিদ ও জন্তু উভয়ের মৃতদেহ থেকে নিজেদের আহার সংগ্রহ করে।

আমিষভোজী জন্তুদের আহারের ধারা (food-chains) অনুসারে ভাগ করা যায়। মানুষ যখন ছাগমাংস খায়—সে একধাপ পেরিয়ে ঘাস খায় বলা যেতে পারে। ঐ মানুষ যখন পোকামাকড়-খেকো পাখি খায় তখন সে দু-ধাপ পেরিয়ে ঘাস খায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, সমুদ্রের 'কড' (Cod) মাছ এক সের ওজনের হোতে গেলে তাকে দশ সের পরিমাণ "ওয়েলক" (Whelk) মাছ খেতে হয়; এক সের ওয়েলকের শরীর পুষ্টির জন্য দশ সের পরিমাণ সামুদ্রিক কীটের প্রয়োজন; এবং সমুদ্রের তলায় যে পাঁক জমে থাকে তার দশ সের পাঁক খেয়ে এক সের কীট পুষ্ট হয়। কাজেই আমরা যখন কয়েক ফোঁটা কড মাছের তেল (Cod Liver Oil) খাই তখন ধরে নিতে পারি যে সমুদ্রের হাজার সের (২৫ মন) জীবাণুর মৃতদেহ ও সামুদ্রিক গাছগাছড়া পচা পাঁকমাটির নির্যাস খাচ্ছি।

পৃথিবীর যেখানেই উদ্ভিদ ও জন্তুশ্রেণী একত্রে বাস করে, তাদের মধ্যে খাদ্য-খাদক ছাড়াও নানা রকম সম্বন্ধ থাকে। খাপছাড়া বিশৃঙ্খলভাবে তারা একত্র বাস করে না। যারা এই শৃঙ্খলার মধ্যে

নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারে, তারা খসে পড়ে। এই রকম অনেক পরিবর্তন ও বাছাইয়ের পর তাদের একটি সমাজ গ'ড়ে ওঠে। আবার এক-একটি সমাজের মধ্যে তার অধীন প্রত্যেক শ্রেণীর জীব অন্য শ্রেণীর জীবের সঙ্গে এমন বন্ধনে আবদ্ধ যে তাদের পরস্পরের সম্বন্ধের একটুও নড়চড় হবার উপায় নেই,—তাহলেই বিপ্লব বেধে যায়। এ'কেই প্রকৃতির সাম্যনীতি (Balance of Nature) বলে। মানুষ এই সাম্যভাব মাঝে-মাঝে তার নির্বুদ্ধিতার দরুন ভাঙতে চেষ্টা করে এবং তার ফলে তাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। দু-একটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। অস্ট্রেলিয়াতে পূর্বে খরগোশ ছিল না। সেখানকার গাছপালা, জন্তুজানোয়ার সবই ভিন্ন প্রকৃতির,—অন্য কোনো দেশের সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। ইংরেজরা যখন সেখানে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করল, তখন তাদেরই একজন শখ করে কয়েকটা পোষা খরগোশ য়ুরোপ থেকে আমদানি করে। এখন খরগোশে অস্টেলিয়া ছেয়ে গেছে। তারা সেখানে এত শীঘ্র বংশবৃদ্ধি করছে যে, সেখানকার গভর্নমেণ্ট লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ ক'রেও তাদের ধ্বংস করতে পারছে না। তাদের দৌরাত্ম্যে চাষবাস কঠিন হয়েছে।

আমাদের দেশেও সম্প্রতি এ-রকম ঘটনা ঘটেছে। কয়েক বছর আগে শৌখিন ফুলগাছ হিসাবে কচুরিপানা (Water Hyacinth) কেউ কলকাতায় আনিয়েছিল বিদেশ থেকে। লোকে আট আনা, এক টাকা দাম দিয়ে এই সুন্দর ফুলগাছ কিনে

বাড়িতে রাখতে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশ কচুরি পানায় ছেয়ে গেল। এখন আইন করে, অনেক টাকা খরচ করে গভর্নমেণ্ট থেকে চেষ্টা হচ্ছে বাংলার খাল-বিল-নদীগুলিকে এই উৎপাত থেকে রক্ষে করতে। কচুরি-পানা চাষীদের পরম শত্রু হয়ে পড়েছে। দেশটাই উচ্ছন্ন যাবে এ-আপদ বিদায় করতে না পারলে।

নিজেদের দেশে এরা এত বাড়তে পায় না, নতুন জায়গায় গিয়ে বেড়ে যায় কেন। নিজের দেশে অন্য গাছপালা জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে তাদের বোঝাপড়া হয়ে গেছে; সেখানে এমন সব শত্রু আছে যারা তাদের দাবিয়ে রাখে। সেখানকার প্রাকৃতিক জগৎ সবাইকে নিয়ে সামঞ্জস্য রেখে চলে, কাউকে অতি বাড় বাড়তে দেয় না। নতুন জায়গায় প্রচলিত সহজীবিদের থেকে দূরে এসে সামাজিক বন্ধনের বাইরে সে যথেচ্ছাচারী হয়ে পড়ে। স্বাধীনভাবে বেড়ে যাবার বাধা দেবার কেউ নেই। নতুন জায়গায় এলে কোনো-কোনো জীব বাড়বার যেমন সুযোগ পায়, তেমনি কারো পক্ষে উলটোটাও হোতে পারে। নতুন জায়গায় এমনি প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে পারে যে, তার পক্ষে জীবন ধারণ করাই হয় অসম্ভব। আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে আরব থেকে ভালো খেজুর গাছ নিয়ে লাগানো হয়েছিল। সেখানকার আবহাওয়ায় গাছ বেশ ভালো জন্মাতে দেখে, সেখানে মস্ত বড়ো-বড়ো খেজুরের বাগান করা হোলো। গাছ বড়ো হোলো, কিন্তু দুঃখের বিষয় ফল ধরল না। তখন বাগানের মালিকরা

গভর্নমেণ্টের শরণাপন্ন হলেন। গভর্নমেণ্ট একজন জীবতত্ত্ববিদ্‌কে অনুসন্ধানের কাজে লাগালেন। তিনি অনুসন্ধান নিতে আরব-দেশে এলেন। তাঁর গবেষণার ফলে বোঝা গেল যে, যে মাছি আরবদেশে খেজুর ফুলের মধু খাবার উপলক্ষে রেণু নিয়ে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে মিশিয়ে বেড়ায়, সেই মাছি ক্যালিফর্ণিয়াতে নেই। কয়েকটা সেই মাছি তখন আরব থেকে এনে সেখানে ছেড়ে দেওয়া হোলো। দু-এক বছরের মধ্যে প্রচুর খেজুর ধরতে আরম্ভ করল। উদ্ভিদ ও পোকার মধ্যে সহযোগের এটি একটি চমৎকার উদাহরণ।

প্রাণীজগতে ব্যষ্টি ও সমাজগত বিরোধের দিকটাই আমাদের নজরে বেশি ক'রে পড়ে। ডারউইন এই দিকটা "সত্তারক্ষার প্রয়াস" (struggle for existence) নাম দিয়ে অনেক নজির দেখিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে, এই হিংস্র প্রবৃত্তি, এই খাওয়া-খাওয়ির ভিতর দিয়েই জীবের ক্রমোন্নতি হচ্ছে। যারা অপটু, যারা ক্ষীণদেহ তারা সহজেই মরে যায়, বলিষ্ঠ ও পটুরাই বংশবৃদ্ধি করতে পারে। সমগ্রভাবে দেখলে জীব-সমাজের প্রকৃতি কিন্তু ঠিক এরকম নয়, বলতেই হবে। মারামারি-কাটাকাটি যে নেই তা নয়, যথেষ্টই আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যদিকও দেখতে পাওয়া যায়; পরস্পরের সহযোগের দৃষ্টান্ত জীবজগতে বিরল নয়। আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই: স্থানীয় আবহাওয়া ও জল-মাটি প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে এক-এক জায়গায় গাছপালা জন্তুজানোয়ার নিয়ে এক-একটি

বিশিষ্ট সমাজ গ'ড়ে ওঠে, তাদের পরস্পরের মধ্যে যেমন লড়াইয়ের অন্ত নেই, তেমনি এটাও সত্য যে, তারা পরস্পরের মধ্যে নানা-বিধ সহযোগসূত্রে গ্রথিত। সেই মৈত্রীসম্বন্ধ আছে ব'লেই জীবসমাজ শৃঙ্খলা রেখে বরাবর চলতে থাকে—তার বিশেষ পরিবর্তন হয় না, যেটুকু পরিবর্তন হয় তা মন্থরগতিতে এবং ধারাবাহিক উন্নতির দিকে।

জীবের ক্রমবিবর্তন

গোঁড়া খ্রীস্টানরা মনে করেন ইতিহাসের গোড়ার দিকে কোনো-এক শুভদিনে—তার তারিখ পর্যন্ত বাইবেলে লেখা আছে—ভগবান জিহোবা কয়েকটি প্রাণীর নমুনা সৃষ্টি ক'রে পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে আদিম নরনারী 'আদম' ও 'ঈভ' ছিল। এদের সন্তান-সন্ততিতে ক্রমশ জগৎ ভরে গেল।

হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা,—সৃষ্টির পূর্বে ঘোর তমসার মধ্যে হিরণ্যগর্ভ থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তপস্যার ফলে ব্রহ্মার এক-এক অবয়ব থেকে এক-এক জীবের সৃষ্টি হয়।

আর বেশি উদাহরণ দেবার প্রয়োজন নেই—এ বিষয় নিঃসন্দেহ যে, সব দেশেই, সব জাতি এবং ধর্মের মধ্যেই, যেন কোনো অলৌকিক উপায়ে হঠাৎ সব সৃষ্টি হয়ে গেল এই ধরনের বিশ্বাস চলন ছিল। মানুষ মানুষ-অবস্থাতেই যেন প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। বিজ্ঞান এই অন্ধবিশ্বাসের মূলে কঠিনভাবে আঘাত দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সনাতন চিন্তাধারাই একেবারে বদলে দিয়েছে গত শতাব্দীর মধ্যে। ভগবানের এক ফুঁয়ে সব সৃষ্টি হয়ে গেল এ-কথা বিশ্বাস না ক'রে আমরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি যে, এখন যে-গাছপালা যে-জন্তুজানোয়ার পৃথিবী অধিকার ক'রে আছে, বহু লক্ষ বছরের ক্রমবিবর্তনের ফলে তবে তারা গড়ে

উঠেছে। পরিবর্তন জীবের ধর্ম। আজ যাকে মানুষ ব'লে দেখছি সে কত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যে এই রূপ নিয়েছে তার ঠিক নেই। তার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করলে দেখব যে, কোনো-এক সময় বনমানুষ এবং তারও আগে বানরের মতো তার চেহারা ছিল। যদি আরো পিছিয়ে খবর নিতে থাকি তবে শেষ পর্যন্ত অ্যামিবার মতো একটি অতি সহজ ও ক্ষুদ্র এককোষী জীবে গিয়ে পৌঁছতে হবে। সহজ থেকে জটিল, জটিল থেকে জটিলতর রূপের ধারাবাহিক ক্রমোন্নতি—এই বিশ্বাসকে বিবর্তনবাদ বলা হয়।

ক্রমবিবর্তন বিংশশতাব্দীর একেবারে নতুন একটা কল্পনা নয়। এমন কি, বিজ্ঞানীরা এ-বিষয় ভাবতে শুরু করার আগেই পুরাকালের তত্ত্বজ্ঞানীরা এর মূল তত্ত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা করে গেছেন। ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্রে এই মতবাদের আভাস পাওয়া যায়। পরে গ্রীসে প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রভৃতি মনীষিরা সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা এই দিক থেকে দিতে চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁদের ভাবধারার মধ্যে বিবর্তনবাদ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি। এই মতবাদ সম্বন্ধে প্রথম স্পষ্ট ধারণা দেখতে পাওয়া যায় ইংলণ্ডে বেকন, ফ্রান্সে দেকার্টে ও জর্মানিতে ক্যাণ্টের লেখার ভিতর। বিবর্তনবাদ তাহলে আকস্মিক একটা কল্পনা নয় দেখতে পাচ্ছি; তবে ডারউইন এবং ওয়ালেস যখন য়ুরোপের বিদ্বানদের কাছে সেটা উপস্থিত করলেন ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে, তা নিয়ে এত হৈ-চৈ, বাদ-প্রতিবাদ হোলো কেন।

বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে দুটো বিষয় পরিষ্কার মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে **ঘটনা**, আর অন্যটা হচ্ছে **মত**। পৃথিবীতে পরিবর্তন হচ্ছে, এক জাতি থেকে অন্য জাতির উৎপত্তি হচ্ছে, জলজন্তু থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে পাখি, পাখি থেকে ক্রমশ স্তন্যপায়ী জন্তু, এই সব ঘটনার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, সে-বিষয় কোনো তর্কই উঠতে পারে না। জীব বিবর্তনশীল, তার প্রারম্ভ অত্যন্ত সহজ প্রাণীরূপে, যুগ যুগ ধরে পরিবর্তন হোতে হোতে এক থেকে বহু, এবং বহুরও ধারাবাহিক ক্রমোন্নতি—ঘটনা হিসাবে এ কথা বিশ্বাস না করার এখন আর উপায় নেই। তত্ত্বজ্ঞানীরা যেটা আন্দাজ বা অনুমান করতেন, বিজ্ঞানীরা তা প্রচুর প্রমাণের দ্বারা সুনিশ্চিত করে দিয়েছেন। কিন্তু **ঘটনা** প্রমাণ করা আর সেই ঘটনার উপর নির্ভর করে একটা **মতবাদ** গড়ে তোলা, এক জিনিস নয়। ক্রমবিবর্তনের ঘটনাসমূহ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেও ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে আমরা মনে সন্দেহ পোষণ করতে পারি।

ক্রমবিবর্তন কী করে হয়, কেন হয়, কোন্ দিকে তার গতি, এই সব প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য ডারউইন, ওয়ালেস এবং অন্য অনেক বিজ্ঞানীরা নানান সময় নানান মতবাদ প্রচার করেছেন। এর মধ্যে ডারউইনই সব-প্রথম অজস্র প্রমাণসহ একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর সন্তোষজনক মতবাদ উপস্থাপন করেন। তখন য়ুরোপের অবস্থা এমন বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মতবাদ গ্রহণ করার অনুকূল হয়-নি, খ্রীস্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বে লোকের অন্ধ বিশ্বাস তখনো সম্পূর্ণ রয়েছে। তাই ঘোরতর প্রতিবাদের আন্দোলন উপস্থিত হোলো।

জীবের ক্রমবিবর্তন

ডারউইনকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত তিনি ওয়ালেস, হাক্‌স্লি, হেকেল, মিল প্রভৃতি কয়েকটি খুব উপযুক্ত চেলা পেয়েছিলেন। এঁদের সাহায্য না পেলে সন্দেহ হয়, ডারউইনের মতবাদ এত শীঘ্র এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত কি না। আমাদের পক্ষে এখন কল্পনা করা শক্ত, এই মতবাদ তখনকার সমাজে কতখানি বিপ্লব এনে দিয়েছিল। কেবল যে বিজ্ঞানীদের নাড়া দিয়েছিল তা নয়, গত শতাব্দীর সমস্ত চিন্তার ধারাই বদলিয়ে দিয়েছিল এই বিবর্তনবাদ। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি মানুষের সকলপ্রকার চিন্তাক্ষেত্রই এই মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এমন কি, এক দল সমাজতত্ত্ববিৎ বলেন, ডারউইন তাঁর অভিব্যক্তিবাদে জীবনসংগ্রাম ও যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনের উপর যে ঝোঁক দিয়েছিলেন তারই ফল ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের য়ুরোপীয়ান মহাযুদ্ধ। কে বলতে পারে ১৯৪০-এর জগদ্‌ব্যাপী যুদ্ধের পিছনেও এই মতবাদের প্রভাব আছে কি না।

ডারউইন ও ওয়ালেস যে-বিবর্তনবাদ খাড়া করেছিলেন, তার যুক্তির পশ্চাতে ছিল কতকগুলি প্রমাণ। তাঁরা দুজনেই নানান দেশ ঘুরে নানান অবস্থায় গাছপালা ও জীবজন্তুর দৈনিক জীবনপ্রণালীর ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ ক'রে দেখেছিলেন জীবমাত্রই পরিবর্তনশীল। যতই আত্মীয়তা থাক্ না কেন, এক প্রাণীর সঙ্গে অন্য প্রাণীর কিছু তফাত আছেই।

পৃথিবীতে অসংখ্য জীব একত্রে ঘেঁষাঘেঁষি বাস করছে।

অথচ আহার্য বস্তু পরিমিত। কাজেই প্রয়োজনমতো যথেষ্ট খাবার সংগ্রহ ক'রে বেঁচে থাকা কারো পক্ষেই খুব সহজ নয়। প্রাণীমাত্রকেই জীবনসংগ্রামে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়। আহার সংগ্রহ ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি তো আছেই, প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিকূল হোলে যে-সব বাধা দিতে থাকে তারো সঙ্গে তাকে যোঝাযুঝি করতে হয়। জীবন-ধারণ করতে এই যে অহরহ সংগ্রাম, তাতে এক ব্যক্তির যদি একটুখানিও বিশেষত্ব তাকে কোনো বিষয় অন্যদের চেয়ে উৎকর্ষ দেয়, তবে তার জোরে অন্যদের হার মানিয়ে সেই ব্যক্তি বেশি বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। যে-বৈশিষ্ট্যের দরুন সে সুবিধা পেল, তার বংশধরদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য আরো ফুটে ওঠা বিচিত্র নয়। অল্পস্বল্প তফাতগুলি এইরকম বাড়তে বাড়তে এত বেশি তফাতে গিয়ে দাঁড়ায় যে অনেক সময় মূল থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ গ্রহণ করে। নতুন-নতুন জাতি এইরকম করে সৃষ্টি হয়। পরিবর্তনের আরম্ভ অতি সূক্ষ্মভাবে হয় ও তার প্রগতি অত্যন্ত ধীরপথে চলে। একটি জাতি থেকে অন্য জাতির উৎপত্তি হোতে হাজার-হাজার বছর লেগে যেতে পারে। যে-নিয়মে এই ক্রমবিবর্তন হয় তাতে বোঝা যায় বিচ্ছিন্নভাবে বড়ো রকমের কোনো পরিবর্তন হঠাৎ হয় না (অন্তত ডারউইনের এই মত, সব প্রাণ-বিজ্ঞানী বিশেষত মেণ্ডেলিয়ানরা এ-কথা সমর্থন করেন না), পরিবর্তন ধীরগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা দেখা যায়।

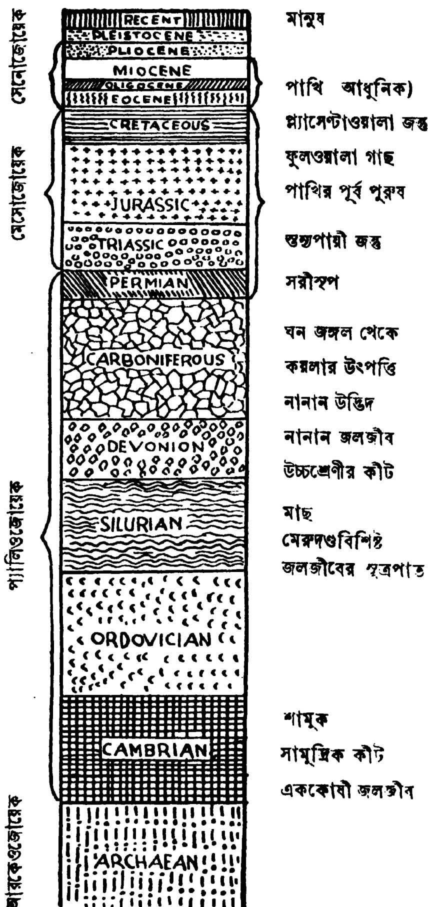
জীবের ক্রমবিবর্তন

আগেই বলা হয়েছে ডারউইন, ওয়ালেস প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলি কী ধরনের প্রমাণ একটু দেখা যাক।

ভূ-পরিচয় থেকে প্রমাণ

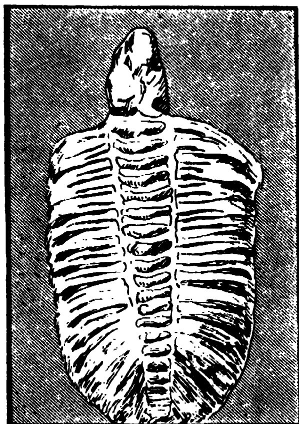
ভূ-বিজ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি পৃথিবীর সমতল ভূমি তৈরি হয়ে উঠেছে স্তরে স্তরে। পাহাড় থেকে পলি এনে নদীর জল একটি স্তর বিছিয়ে দিয়ে যায় প্রতি বছর। স্তর বছর বছর যতই উঁচু হোতে থাকে, তলার দিকে তার উপর চাপ পড়ে। নিচের মাটি তাই ক্রমশ শক্ত হয়ে জমে পাথরে পরিণত হয়। ভূ-বিজ্ঞানীরা এক-একটি স্তরের প্রকৃতি ও গুণবিচার ক'রে সঠিক বলতে পারেন সেই সেই স্তরের বয়স কত। নানা জায়গার স্তর পরীক্ষা ক'রে পৃথিবীর ক্রমবিবর্তনের একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস তাঁরা খাড়া করতে পেরেছেন। তাঁরা দেখেছেন পৃথিবী গড়ে ওঠবার ইতিহাসে দু-চার হাজার বছর কিছুই না; তাঁদের হিসাব করতে হয় যুগ ধরে।

যে-যুগে পৃথিবীর যে-স্তর তৈরি হয়েছে সেই যুগে যে-সব প্রাণী বেঁচে ছিল তাদের কিছু না কিছু চিহ্ন সেই স্তরে থেকে গেছে। অনেক বছর ধরে মাটির নিচে পোঁতা থাকলে গাছের গুঁড়ি



৩৭. কালক্রম অনুসারে সাজানো পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের স্তর
বাঁ-দিকে : মহাযুগের নাম। ডান-দিকে : যে-স্তরে যে-প্রাণীর
ফসিল পাওয়া গেছে তাদের নাম

বা জন্তুর হাড় পাথর হয়ে যায়। এই রকম পাথর-হয়ে-যাওয়া জৈব পদার্থকে 'ফসিল' (fossil) বলে। পুরাতন যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে যে-সব জাতীয় প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে তা যদি পর পর সাজিয়ে রাখা যায়, তবে তাদের মধ্যে বেশ ধারাবাহিকতা লক্ষ্য হবে। বর্তমান যুগের যে-কোনো গাছ বা জন্তুর পূর্বপুরুষের ইতিহাস যদি মাটির স্তরের ভিতর অনু-সরণ ক'রে যাওয়া যায়, তবে যতই এক-এক ভৌগোলিক যুগ পিছিয়ে তাদের চিহ্ন পাব, দেখব তার রূপ পরিবর্তন হয়ে গেছে। যার গঠন এখন জটিল পূর্ব-যুগে তার গঠন অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। নানান জাতীয় জীবের নানান সময়কার এত শিলীভূত চিহ্ন বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন যে, তার থেকে বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারেন, যুগ-যুগ ধরে প্রাণীর যে ক্রম-বিবর্তন চলেছে তার মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ নেই। ডারউইনের সময়েও বিচ্ছেদের যে-সব সূত্রগুলি নিখোঁজ (missing



৩৮. ফসিল (fossil)

links) ছিল পরবর্তীকালে তার অধিকাংশই খুঁজে পাওয়া গেছে। মানুষ, ঘোড়া, হাতি প্রভৃতি সবরকম প্রসিদ্ধ জন্তুদেরই ক্রমবিকাশের ইতিহাস মাটির তলা থেকে সংগ্রহ করা গেছে। বানর কিংবা বনমানুষ থেকে কী ক'রে মানুষ গড়ে উঠল, মানুষেরও একটু-একটু করে বদল হয়ে কেমন উন্নতি হয়েছে তার প্রমাণ ধাপে-ধাপে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে থেকে গেছে। মাটির নিচে থেকে যত এইরকম চিহ্ন বেরোচ্ছে, বড়ো-বড়ো মিউজিয়ামে সেগুলি সযত্নে রাখা হচ্ছে। সেগুলি মিলিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে জীবজন্তুর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস বেশ গড়ে তোলা যায়। দেখা যায়, গোড়ায় আরকেজোয়েক (archaeozoic) যুগে জীবের সবে জন্ম হয়েছে ; তখন অ্যামিবার মতো এককোষী জীবেরই চিহ্ন কেবল পাওয়া যায়। তার পর প্রোটেরোজোয়েক (proterozoic) যুগে বহুকোষী জীবের মধ্যে নানারকম পোকামাকড় দেখা দিয়েছে। অরডোভিসিয়ান (ordovician) ও সিলুরিয়ান (silurian) যুগে শিরদাঁড়াওয়ালা মাছ জন্মেছে এবং অন্য জলজন্তুর চিহ্নও দেখা যায়। তারও অনেক পরে মেসোজোয়েক (mesozoic) যুগ হচ্ছে সরীসৃপদের যুগ। এবং সবশেষে সেনোজোয়েক (cenozoic) অর্থাৎ বর্তমান যে-যুগ, এই যুগের আরম্ভ হোতে পাখি ও দুগ্ধপায়ী জন্তু ; ঘাস, বাঁশ ও অন্যান্য ফুলওয়ালা গাছগাছড়া ইত্যাদি যে-আধুনিক প্রাণীজগতের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ট পরিচয় তার খোঁজ পাই। এত রকমের প্রাণীর উৎপত্তি হোতে কী বিস্তীর্ণ সময় লেগেছে, আমাদের পক্ষে ধারণা করা

কঠিন। মানুষের ইতিহাসের কালপরিক্রম হিসাব করতে যে-যুগের কল্পনা করি তাতে কুলোয় না—প্রাণীর ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এক-একটা যুগ, যাদের নাম করা গেছে একটু আগে, লক্ষ লক্ষ বছর হিসাবে চলে।

ভৌগোলিক প্রমাণ

পৃথিবীর এক-এক অঞ্চলে এক-এক বিশেষ ধরনের জীবজন্তু দেখতে পাওয়া যায়। স্থানবিশেষে জীবশ্রেণীর এই রকম বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে কী ক'রে। বিশেষ দেশের বিশেষ আবহাওয়ার গুণে এই রকম হয়, তা সম্পূর্ণ বলা যায় না।

প্রত্যেক বাগানেই কত ফুল ও ফলের গাছ থাকে যা বিদেশ থেকে আমদানি। চীন দেশ থেকে আমাদের দেশে লিচু এসেছিল, গোলাপ ইরান থেকে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া থেকে ইউকালিপ্টাস্ (Eucalyptus) গাছ এসেছে এবং আমাদের দেশে এগুলি সর্বত্র সহজেই জন্মাচ্ছে। কাজেই কেবল আবহাওয়ার গুণে জীব-জন্তুর বিশেষত্ব প্রকাশ পায় তা ঠিক নয়। পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে জীবের ইতিহাস জড়িত। অধিকাংশ মহাদেশগুলি এখন যেমন পরস্পর যুক্ত, পুরাকালে তা ছিল না। তারা বিচ্ছিন্ন ছিল, এক-একটি মহাদ্বীপের মতো, যেমন এখনো অস্ট্রেলিয়া রয়েছে। চারদিকে সমুদ্রে ঘেরা তাই এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে জীবজন্তুদের চলাচল সম্ভব হোত না। সেইজন্য বিভিন্ন মহাদেশের

জীবশ্রেণীর ক্রমবিকাশ বিভিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়েছে। বিভিন্ন দেশের জীবজন্তুর ক্রমবিবর্তনের ইতিবৃত্ত সেই সেই দেশের মাটির তলায় থেকে গেছে। বিজ্ঞানীরা এই টুকরো-টুকরো ইতিহাস একত্রে মিলিয়ে দেখে ক্রমবিবর্তনের একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার করেছেন। এর মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ নেই, সমগ্র একটা ছবি আমাদের সামনে ধরে দিতে পেরেছেন।

দেহগঠন থেকে প্রমাণ

যে-কোনো দুই বা ততোধিক শ্রেণীর জীবজন্তুদের দেহ যদি তুলনা ক'রে দেখা যায় তবে দেখতে পাব তাদের গঠনের মধ্যে মিল আছে। বাইরের চেহারায় সাদৃশ্য না থাকলেও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য প্রকাশ পায়। ঘাস ও বাঁশ যে এক-জাতীয় উদ্ভিদ তা তাদের পাতা, ডাঁটা, ফুল ও বীজের গড়ন থেকেই ধরা পড়ে। তেমনি বেড়ালের চেয়ে সিংহ অনেক বড়ো জানোয়ার হোলেও তাদের দেহগঠন থেকে তারা যে এক-জাতের সহজেই বোঝা যায়। জাতিগত মিল তো আছেই, বিভিন্ন জাতির মধ্যেও শরীরগঠনে মূলগত খুব পার্থক্য নেই। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবয়বগুলি ভালো ক'রে দেখলে সাধারণভাবে একটা ঐক্য লক্ষ্য হবে। জীবজন্তুর পরস্পরের মধ্যে যদি কোনো ঐতিহাসিক যোগ না থাকে তবে এই রকম ঐক্য থাকবে কেন।

বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে-সব চিহ্ন (vestigal organs)

জীবজন্তুর শরীরে থেকে গেছে তার থেকে বিবর্তনবাদের আর-একটি খুব প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা



৩৯. মানুষের পূর্বপুরুষ

ফসিল অবলম্বনে চেহারা অনুমান করা

যেতে পারে : তিমিমাছ বা সাপের পা ; মানুষের তৃতীয় চোখ, অ্যাপেণ্ডিক্‌স্‌ ও লেজ ; গুহাবাসী জন্তুদের চোখ ; উড়তে পারে না এমন অনেক পোকার ডানা। ব্যবহার অভাবেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণে হোক, এই অঙ্গগুলি লোপ পেলেও তারা নিজেদের কিছু না কিছু চিহ্ন রেখে যায় শরীরে। মানুষের লেজ এখন নেই কিন্তু মেরুদণ্ডের শেষভাগে এক টুকরা

হাড় দেখে বোঝা যায়, এক সময় তার লেজ ছিল। ক্রমবিবর্তনের ফলেই এই সব অঙ্গ লোপ পেতে বসেছে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভ্রূণতত্ত্ব থেকে প্রমাণ

মার পেটে জন্তুরা যতদিন ভ্রূণ অবস্থাতে থাকে, তাদের দেখতে সব এক রকম। যে-কোনো জন্তুর ভ্রূণ প্রথম অবস্থায় দেখে তা মানুষ না বেড়াল, মুরগি না সাপ, কী হয়ে জন্মাবে বলা যায় না। ভ্রূণমাত্রই প্রথমটা মাছের মতো দেখতে হয়। যেমন বড়ো হোতে থাকে ক্রমশ তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। বিবর্তনবাদ মানলে সহজেই বুঝতে পারব কেন ভ্রূণের এই রকম পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আমরা এখন জানি, যে-জন্তুদের নাম করলুম তাদের সকলেরই পূর্বপুরুষ ছিল মাছের মতো কোনো জলজন্তু। তাদের জাতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশ ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধির মধ্যে প্রতিফলিত হোতে দেখা যায়।

চার রকম প্রমাণের উল্লেখ করা হোলো মাত্র। বিবর্তনবাদের সমর্থনের জন্য আরো অনেক প্রমাণ খুঁজে পাওয়া শক্ত নয় তবে যেটুকু বলা হোলো তার থেকেই বেশ বোঝা যাবে, জীবজগতের বৈচিত্র্য ক্রমবিবর্তনের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। আকস্মিকভাবে কোনো জীব এসে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়নি।

জীবের ক্রমবিবর্তন

ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে মতবাদ

জীবপ্রকৃতি সব সময়ই বদলাচ্ছে, কেউ একভাবে বেশিদিন থাকে না—এ-কথা মেনে নিলেও প্রশ্ন ওঠে ক্রমবিবর্তন কেন হয়, কী করে হয়। বিবর্তনের প্রণালী কী। ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশের সঙ্গে জাতিগত পার্থক্যের সম্পর্ক কী।

এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এক কথায় হয় না। বিজ্ঞানীদের মধ্যেও এ-বিষয়ে মতৈক্য নেই, নানা মুনির নানা মত। লামার্ক (Lamarck) থেকে আরম্ভ ক'রে হাল আমল পর্যন্ত কত রকম মতবাদ যে সৃষ্টি হয়েছে তার ঠিক নেই। এই পরস্পরবিরোধী বহু মতবাদের জঞ্জালের মধ্যে না গিয়ে চেষ্টা করা যাক বুঝতে প্রাণবিজ্ঞানীরা যে সব যুক্তি বা সত্যের উপর নির্ভর ক'রে তাঁদের মতবাদ খাড়া করেছেন সেগুলি কী।

যে-সত্যের উপর সব মতবাদেরই ভিত গড়া হয়েছে, সে হচ্ছে: জীবমাত্রের পরিবর্তনশীলতা। কোনো জীব আর-একটি জীবের হুবহু অনুকরণ নয়। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে এই যে অল্পবিস্তর প্রভেদ, বংশপরম্পরায় সেগুলি বাড়তেই থাকে, তাতে কখনো বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে আবার কখনো লোপ পেয়ে যায়। এই ভেদপ্রণালী চলতে চলতে বংশধরদের মধ্যে ক্রমশ যখন অনেকখানি প্রভেদ দাঁড়িয়ে যায়, তখন আমরা তাদের ভিন্ন জাতি ব'লে স্বীকার করে নিই।

লামার্কের মতে, যে-সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিত্য ব্যবহারে লাগে

তার উন্নতি হোতে থাকে, ব্যবহার না হোলেই অবনতি ঘটে। জিরাফের গলা অত লম্বা হয়েছে, গলা বাড়িয়ে গাছের পাতা খাবার চেষ্টায়। মানুষ দ্বিপদী হবার পর থেকে লেজ ব্যবহারে অসুবিধা ব'লে তার এই অঙ্গটি লোপ পেয়েছে। কথাটা ঠিক, কিন্তু একটু গোল বাধে এক জায়গায়। ব্যবহার বা না-ব্যবহারের দরুন অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুণে ব্যক্তিবিশেষের জীবদ্দশায় যে-সব পরিবর্তন ঘটে, সেগুলি কি তার সন্তানে গিয়ে বর্তায়। ভাইসমান প্রমুখ একদল বিজ্ঞানী স্বোপার্জিত (acquired) গুণ বংশানুগত হয় না মনে করেন। তা সত্য হোলে, পুরুষানুক্রমে ইঁদুরের লেজ যদি ক্রমাগত কেটে দেওয়া যায় তবে সেটা ছোটো হোতে হোতে কয়েক পুরুষ বাদে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তা তো হয় না। লামার্কের মতবাদ ডারউইনও বিশ্বাস করতে পারেননি। ডারউইন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করে তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

যে-প্রাকৃতিক ঘটনাটি ডারউইনের মনকে সবচেয়ে বেশি ভাবাবিষ্ট করেছিল, সে হচ্ছে জীবের ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা। এমন অনেক গাছ আছে যার একটি গাছেই লক্ষাধিক বীজ জন্মায়। মশা, মাছি, উই, পিঁপড়ে—এদেরও কম ডিম হয় না। সব ডিম যদি ফুটত এবং সব বংশধরই বাঁচতে পেত, তবে আর-কোনো জীবের স্থান হোত না পৃথিবীতে, সব জায়গা ছেয়ে ফেলত এরাই। এরা খুব শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি করতে পারে ; এদের কথা ছেড়ে যাদের

খুব কম সন্তান জন্মায় তাদের কথাই ধরা যাক না কেন। হাতি প্রায় একশ' বছর বাঁচে। এই দীর্ঘ জীবনের মধ্যে গড়পড়তা তাদের ছ'টার বেশি বাচ্চা হয় না দেখা গেছে। একজোড়া হাতির সব বংশধরকে যদি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হোত তবে পাঁচশ' বছরের মধ্যে ১,৫০,০০,০০০ হাতির জন্ম হোত। এত হাতি তো কখনো দেখতে পাওয়া যায় না, তবে তারা কোথায় যায়। নিজেদের মধ্যে রেষারেষি এবং অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তার অধিকাংশই বাঁচতে পারে না। সংখ্যা যত বাড়ে, খাবার কম পড়ে, প্রতিযোগিতা হিংস্ররূপ ধারণ করে। সত্তা রক্ষার এই প্রয়াসে যারা উতরে যায় তাদের নিশ্চয়ই কিছু বিশেষ গুণ আছে যার জোরে অন্যদের পরাভূত ক'রে তারা নিজেদের টিঁকিয়ে রাখতে পারে। সেই গুণগুলি বংশানুক্রমে উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে। কারণ, যাদের বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে, তারাই সংগ্রামে সবচেয়ে ভালো যুঝতে সক্ষম, ধরে নেওয়া যেতে পারে। একেই ডারউইন বলেছেন যোগ্যতমের উদ্বর্তন (**survival of the fittest**)। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে জীবনসংগ্রাম বাড়ে ; জীবনসংগ্রাম যতই বাড়ে প্রাকৃতিক নির্বাচন (**natural selection**) ততই জোরে কাজ করে।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আর-একটি ব্যাপার —যৌন নির্বাচন। জন্তুজানোয়ারের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ যেমন-তেমন ভাবে মেলে না, তারা পরস্পরকে পছন্দ ক'রে বাছাই ক'রে নেয়। সেই সব পুরুষেরই চাহিদা বেশি যারা জীবন-

সংগ্রামে যুঝতে পারে ভালো। যৌন নির্বাচন ও প্রাকৃতিক্ নির্বাচন পরস্পরবিরোধী প্রণালী নয়, একটি আর-একটির অঙ্গ। এই রকম বাছাইয়ের ফলে ধীরে-ধীরে একটি ধারা অবলম্বন করে জীবজন্তুর পরিবর্তন এবং উন্নতি হোতে থাকে। এই হোলো খুব সংক্ষেপে ডারউইনের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে বিশেষ মতবাদ (Darwin's Theory of Natural Selection)।

অনেক বছর পর্যন্ত এই মতবাদের বিরুদ্ধে খাঁটি বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কিছু বলতে সাহস করেনি। তার প্রধান কারণ ডারউইনের প্রত্যেক যুক্তির পিছনে ছিল ঝুরি-ঝুরি প্রমাণ। সেইজন্য তাঁর কোনো কথার প্রতিবাদ করতে কারো সাহস হয়নি যথেষ্ট বিরুদ্ধ প্রমাণ সংগ্রহ না ক'রে। আর-একটা কারণ, সৌভাগ্যবশত তিনি অনেকগুলি কৃতী ও গুণী চেলা পেয়েছিলেন। তাঁরা এই মতবাদের সমর্থনে নানা দিক থেকে প্রচুর মালমসলা সংগ্রহ ক'রে এ-কে প্রতিষ্ঠিত রাখবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম আঘাত এসে পড়ল মেণ্ডেলের আবিষ্কার থেকে। মেণ্ডে-লিয়ানরা কেবল যে বংশক্রম সম্বন্ধে লামার্কের মতবাদ অসম্ভব ব'লে উড়িয়ে দিলেন তা নয়, ডারউইনের ধীরপন্থায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের কল্পনাকে সত্য ব'লে মানতে চাইলেন না। তাঁরা বহু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করে দেখলেন যে, পরিবর্তন (variation) সব সময়েই যে একটি ধারা অনুসারে (continuous) হয় তা নয়। বিচ্ছিন্নভাবে যখন-তখন হঠাৎ বড়ো রকমের পরিবর্তন (discontinuous variation) হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

ডে-ভ্রীজ (De Vries) তাঁর বাগানে, অল্প সময়ের মধ্যে এমন সব নতুন ধরনের গাছ সৃষ্টি করতে পারলেন যে, উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা তাদের নতুন জাতিত্ব স্বীকার ক'রে নতুন নামকরণ করতে বাধ্য হলেন। ডে-ভ্রীজ উচ্চকণ্ঠে আস্ফালন করে বলতে লাগলেন,—"ডারউইন-মতবাদীরা মনে করেন যে, যে-কোনো একটি গুণের ক্রমবিবর্তন হোতে হাজার-হাজার বছর লাগে, আর আমি আমার ফুল-বাগানের ল্যাবরেটরিতে চোখের সামনে বিবর্তনের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিলুম।" ডে-ভ্রীজের বিশ্বাস, এই রকম আচমকা পরিবর্তনের সাহায্যে জীবজগতের উন্নতি এত শীঘ্র সম্ভব হয়েছে। তাই তাঁর মতবাদের নাম দিলেন Mutation Theory।

ডে-ভ্রীজের আবিষ্কারের পর থেকেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্রমবিবর্তন নিয়ে নানারকম পরীক্ষা (experimental evolution) করার হুজুক লেগে গেল। গাছপালা, পোকামাকড়, জন্তুজানোয়ার কিছুই বাদ পড়ল না, সকলের উপরই অত্যাচার চলতে লাগল। আমেরিকায় টাওয়ার (Tower) এমন একটি ঘর তৈরি করলেন যার ভিতর ইচ্ছামতো শীতগ্রীষ্মের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারা যায়। গরম দেশের জীবজন্তু তার ভিতর ভ'রে, ঘরটা খুব ঠাণ্ডা রেখে, দেখতে লাগলেন তাদের কোনো পরিবর্তন হয় কি না, এবং হোলে সেই পরিবর্তন বংশানুক্রমে স্থায়ী হয় কি না। ঐ সময় এই ধরনের যত পরীক্ষা হয়েছিল তার মধ্যে মাছি নিয়ে মর্গান (Morgan) যে পরীক্ষা করেছিলেন তা খুব বিস্ময়কর। তিনি কেবল যে ইচ্ছামতো এদের শরীরে নানারকম

স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন তা নয়, তিনিই প্রথম স্ত্রী-পুরুষভেদের অন্তর্নিহিত কারণ আবিষ্কার করেন।

ডারউইনের মতবাদ অপ্রমাণিত করবার জন্যই এত উৎসাহ-সহকারে প্রাণবিজ্ঞানীরা পরিবর্তনপ্রবণতা এবং বংশানুক্রম সম্বন্ধে নানান পরীক্ষা করতে মেতে ওঠেন। কিন্তু কয়েক বছর ধরে এই বিষয়ে পরীক্ষা চলতে থাকলে ফলাফল বিচারের সময় দেখা গেল, লামার্ক এবং ডারউইন কাউকেই একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। লামার্কের মতে ব্যক্তিগত জীবনের স্বোপার্জিত গুণ বংশানুক্রমে প্রবর্তিত হোতে পারে। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হোলো যে, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এইরূপ স্বোপার্জিত গুণ জার্ম-সেলের এমন পরিবর্তন ঘটায় যে, সেই গুণগুলি বংশানুক্রমে স্থায়ী হয়ে যায়। এটাও দেখা গেল, ডারউইনের বিরুদ্ধবাদীরা যে স্বতঃপ্রসূত আকস্মিক পরিবর্তনের (mutation) উপর এত ঝোঁক দিয়েছিলেন, তা অনেক সময় ঘটতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্রমবিবর্তনের প্রগতি ডারউইনের বিবৃত প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধীর মন্থর গতিতেই চলে।

ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদের ইতিহাস বিচার করে দেখলে দেখা যায়, গত অর্ধশতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস একবার একদিকে আবার অন্যদিকে ক্রমাগত দোলা খাচ্ছে। কখনো লামার্ক-ঘেঁষা মত বেশি চলে, কখনো ডারউইনের প্রতিপত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, কখনো বা ডে-ভ্রীজ, বেটসন প্রভৃতি

আধুনিকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ-বিষয়ে আমাদের মনে হয়, কোনোদিকেই অতি বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই, সত্যঘটনা যে-দিকেই সাক্ষ্য দিক না কেন আমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। হাল আমলে অনেক প্রাণবিজ্ঞানী মধ্যপথ-অবলম্বী।

এই প্রসঙ্গে আর-একশ্রেণীর মতবাদীদের কথা বলা দরকার। তাঁরা সকলেই বিবর্তনবাদী কিন্তু ডারউইন, হাকস্‌লি, হেকেল প্রভৃতির মতো কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের উপর তাঁরা নির্ভর করতে পারেন না। যে-ভাবে ক্রমবিবর্তন হয়ে পৃথিবীতে এত বিচিত্র জীবজন্তুর জগৎ গড়ে উঠেছে, সে যে কেবল প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো অন্ধ অচেতন নিয়মে হয়েছে, তা তাঁদের বিশ্বাস হয় না। প্রাকৃতিক নির্বাচনের গতির ঠিক নেই, উন্নতির দিকেও যেতে পারে, অধোগতির দিকও নিতে পারে। তবে ক্রমবিবর্তন কেবলমাত্র উন্নতির সূত্র ধরে এতকাল চলেছে কেন। তাই এর ভিতর তাঁরা অন্য রকম কোনো প্রেরণা, কোনো শক্তির পরিচয় দেখতে পান, যার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া চলে না মনে করেন। যাঁরা এইভাবে প্রাণীজগতের অভিব্যক্তির উপর ঐশ্বরিক প্রভাব অনুভব করেন তাঁদের প্রাণৈকান্তবাদী (vitalists) বলা হয়। এঁরা অন্যদের বস্তু-তান্ত্রিক বা যন্ত্রবাদী (mechanists) ব'লে অবজ্ঞা করেন। খুব সম্প্রতি এই দুই ভাবধারার সমাবেশের চেষ্টা করেছেন দক্ষিণ আমেরিকার জেনারেল স্মাটস (General Smuts) তাঁর মতবাদ 'হোলিজম' (Holism) নামে প্রসিদ্ধি লাভ

করেছে। তাঁর বিশ্বাস, পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য একটা ঐকান্তিক চেষ্টা প্রকৃতির অন্তরে নিহিত আছে। সেই প্রেরণার বশেই জীবজন্তুরা উন্নতির ধাপে-ধাপে অগ্রসর হচ্ছে পূর্ণতার দিকে।

শেষ কথা

বইয়ের শেষ অধ্যায়ে পৌঁছানো গেল। ভূমিকায় যে-বিষয়ে কেবল প্রশ্ন তুলেই খালাস পাওয়া গিয়েছিল, এখন অত সহজে নিষ্কৃতি নেই। প্রাণ ব্যাপারটা কী, তার আলোচনার সময় হয়েছে; এই মৌলিক প্রশ্নের বিচার আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

প্রাণের বিশেষ লক্ষণ বা গুণের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, এখন আর-একবার স্মরণ ক'রে দেখলে ক্ষতি নেই।

(১) অজৈব পদার্থ নির্বিকার, নিশ্চল। জীবমাত্রেই সচল ও পরিবর্তনশীল। গাছের চলাচলের ক্ষমতা না থাকলেও সে স্থির নয়। তার ডগা ঠেলে আকাশের দিকে ওঠে, তার ফুলের পাপড়ি ফুটে' ঝ'রে পড়ে, লতা ঘুরেঘুরে গাছের ডালপালা বেয়ে কতদিকে যায় ছড়িয়ে।

(২) জৈববস্তু বাইরের আঘাতে সাড়া দেয়। আঘাত যেমন নানাবিধ, সাড়া দেবার প্রণালীরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট। আমরা মৃদু গরমে পাই আরাম, অতি গরমে পাই কষ্ট। অল্পস্বল্প ঠাণ্ডায় আমাদের চনমনে করে তোলে, অতি শীতে ঘুম আসে।

(৩) বৃদ্ধি জীবমাত্রেরই লক্ষণ। বৃদ্ধি হয় ভিতর থেকে,

বস্তুপিণ্ডযোগে বাইরে থেকে নয়। বৃদ্ধির জন্য বাইরে থেকে আহার্য বস্তু নেওয়া হয় সত্য, কিন্তু তাকে ভেঙেচুরে নিজস্ব করে নিয়ে তবে শরীরের পোষ্টাই ও বৃদ্ধির কাজে লাগানো হয়।

(৪) জীবেরাই কেবল নিজেকে ভাগ ক'রে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এ ছাড়াও বংশবৃদ্ধির আরো অভিনব এবং সুনিপুণ উপায় তারা আবিষ্কার করেছে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে।

(৫) সব শেষে আছে মৃত্যু।

জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি

জড় ও জৈব প্রকৃতির মধ্যে যে-সব পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হোলো তার মধ্যে বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা প্রাণীদের অসামান্য প্রতিপত্তি দিয়েছে। জীব থেকেই কেবল জীবের উৎপত্তি সম্ভব। কোনো জীব আপনা হতে বা কোনো জড়বস্তু থেকে জন্মাতে পারে না। কেবল তাই নয়, যে-কোনো জীবের জন্মের ধারা বেয়ে যদি পিছন দিকে খোঁজ নিয়ে চলি, তবে যেতে-যেতে কোথাও বাধা পাব না, সূত্র কোথাও ছিন্ন হবে না, পৌঁছাব গিয়ে একেবারে আদিসৃষ্টির সমুখে। জীবনের ধারা অবিচ্ছিন্ন।

জীবজগতের ব্যাপ্তি

জীবের সৃষ্টি হয়েছিল খুব সহজ এবং সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে। ক্রমবিবর্তনের ফলে ক্রমশ তাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে জটিলতা ও বৈচিত্র্য। ক্রমবিবর্তন-ইতিহাসের খুব প্রাক্কালেই উদ্ভিদ ও জন্তু পৃথক হয়ে যায়। তার পর এই দুই মহাজাতি থেকে কত না জাতি, উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবীর আনাচে-কানাচে সর্বত্র তারা ছড়িয়ে রয়েছে, কোথাও ফাঁক নেই। ডাঙার উপর এক বিন্দু জায়গা কোথাও নেই যেখানটা কোনো না কোনো জীব অধিকার করে নেই। সমুদ্রের অতল গভীরেও বিচিত্র জীবজন্তু। হাওয়ায় অসংখ্য জীবাণু ভেসে বেড়ায়। বেলুনের সাহায্যে আকাশের খুব উঁচু স্তর থেকে হাওয়ার নমুনা নিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, প্রায় ৭ মাইল উপরেও যথেষ্ট জীব চলাফেরা করে। সবচেয়ে গভীর সমুদ্র ৭ মাইলের বেশি গভীর নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর উপর নিচে ১৪ মাইল ব্যাপী জীবের লীলাভূমি। পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য গ্রহ উপগ্রহে কোনোরকম প্রাণীর সন্ধান এখনো পর্যন্ত সঠিক পাওয়া যায়নি।

প্রথম সৃষ্টি

বিন্দুপ্রায় একটিমাত্র সেল থেকে জীবলোকের সৃষ্টি, বিজ্ঞান এ-কথা প্রমাণ করেছে। কিন্তু সেই আদিম সেল জন্মাল কী করে,

এই প্রশ্নের নিঃসন্দেহ জবাব বিজ্ঞান এখনো দিতে পারেনি। কী রকম ঘটনাচক্রে জীব-সেল সৃষ্টি হয়েছিল তা জানবার কোনো উপায় নেই। যে-বিষয় সঠিক না জানা যায় সে-বিষয় বিজ্ঞান নীরব, আন্দাজ ক'রে কোনো কথা বলা তার কর্তব্য নয়। সেইজন্য আদিম সৃষ্টির বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের ভার বিজ্ঞানীরা তত্ত্বজ্ঞানীদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা সেই সুযোগে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে মন দিয়েছেন; নানারকম রাসায়নিক বস্তুসংযোগে জৈব বস্তু প্রস্তুত করতে পারেন কি না চেষ্টা দেখছেন। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সফল হোলে জীবসৃষ্টির রহস্য ল্যাবরেটরির টেবিলেই মীমাংসা হয়ে যাবে, অনুমান বা তর্ক-বিতর্কের আর প্রয়োজন হবে না, তাঁদের এই দুরাকাঙ্ক্ষা।

আদিম জীব-সেল পৃথিবীতে কী করে জন্মগ্রহণ করেছিল সে-বিষয় কিছু সিদ্ধান্ত না হোলেও যেটুকু আন্দাজ করা যায় তাতে মনে হয় দুটি সম্ভাবনা আছে :

(১) অন্য কোনো গ্রহ থেকে উল্কাপাত জীবকণাকে এনে দিয়েছে পৃথিবীতে। ঘটনাটা অসম্ভব না হোলেও এটা সম্পূর্ণ আন্দাজের কথা। আমাদের জানবার বা পরীক্ষা করবার উপায় নেই। এবং যদিবা সত্য হয় তবু জীব কী করে প্রথম সৃষ্ট হোলো সে প্রশ্ন, প্রশ্নই থেকে যায়।

(২) বেশি প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, পৃথিবী যখন সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়নি, তখন তার তপ্ত জলরাশির মধ্যে কোনো-এক সময় এমন অবস্থা উপস্থিত হয়েছিল যখন সেলের প্রোটোপ্ল্যাজমের মতো

কোনো জৈব-বস্তু দানা বাঁধবার সুযোগ পেয়েছিল। তখনকার মহাসমুদ্রের জলে প্রচুর পরিমাণে ছিল ধাতব পদার্থ; আকাশের বাষ্পীয় চাপ ও জলের উত্তাপ এমন ছিল যাতে রাসায়নিক ক্রিয়া খুব সহজে হয়। এই অবস্থায় জৈবিক প্রোটিনবস্তু হঠাৎ তৈরি হওয়া বিচিত্র নয়। পৃথিবীর ইতিহাসের যে-অবস্থা-চক্রে এইরূপ প্রোটিন প্রস্তুত হবার এত সুযোগ ঘটেছিল তা পুনরায় ঘটবার সম্ভাবনা নেই। বিজ্ঞানীরা অবশ্য খুবই চেষ্টা করেছেন কৃত্রিম উপায়ে এই ঘটনা সম্ভব করবার। একেবারে যে তাঁরা নিষ্ফল হয়েছেন তা নয়। কয়েকটি ধাতব পদার্থ, জল ও অ্যামোনিয়া থেকে আমাদের শরীরে যে ইউরিয়া (urea) বা অ্যামিনো-এসিড (amino-acid) হয়, তার মতো জিনিস তাঁরা ল্যাবরেটরিতে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এইরকম পরীক্ষা করতে করতে হয়তো একদিন সেলের প্রোটোপ্ল্যাজমই বা তৈরি হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে জৈববস্তু সৃষ্টি করতে যে উদ্যত হন, এতটা সাহস তাঁদের কী করে আসে। তার একটু কারণ আছে। জীবজন্তুর দেহক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের গড়া কলকবজার স্বভাবের অনেকখানি মিল আছে।

আমরা জানি, মোটর-এঞ্জিনকে পেট্রোল খেতে দিতে হয়, পেট্রোল পুড়িয়ে সে যে-শক্তি আহরণ করে তার জোরে চাকা ঘোরে। জীবজন্তুর বেলাও ঠিক তাই। খাদ্যসামগ্রীকে অক্সিজেন দিয়ে পুড়িয়ে যে-শক্তি সঞ্চয় করে তারই জোরে সে

চলাফেরা কাজকর্ম করে। মোটরে পোড়া তেলের বাষ্প পাইপ দিয়ে বের করে দিতে হয়; আমাদেরও শরীর থেকে পরিত্যক্ত খাদ্যবস্তু নিষ্কাশিত করবার নানা উপায় আছে। এই দিক থেকে দেখলে, জীবজন্তুর শরীর যে-কোনো মেশিনের সঙ্গে নিখুঁত ভাবে তুলনা করা চলে। প্রত্যেক বিষয়ে মিল আছে। তফাতের মধ্যে আমাদের শরীরের মতো এমন উৎকৃষ্ট মেশিন মানুষ এখনো তৈরি করতে পারেনি। তার বিশেষত্ব হচ্ছে, কখনো বেগড়ালে শরীরের ভিতরই এমন ব্যবস্থা আছে যে, সে নিজেই নিজের মেরামত করে নিতে পারে অনেকখানি। কিন্তু মেশিন বেগড়ালে এঞ্জিনিয়ারের দরকার—তার নিজের ক্ষমতা নেই সংশোধন করে নেয় নিজেকে।

আমাদের শরীরের সঙ্গে কলকব্জার এই আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে একদল বিজ্ঞানী মনে করেন যে, জীবমাত্রই মেশিন ছাড়া আর কিছু নয়। জীবনপ্রণালী কেবলমাত্র বস্তু-বিজ্ঞানের নিয়মের দ্বারা চালিত। এঁদের সেইজন্য যন্ত্রবাদী বলা হয়। অন্য-পক্ষে প্রাণৈকান্তবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, আমাদের দেহ বাইরে থেকে যতই কেননা যন্ত্র ব'লে মনে হোক, জড়প্রকৃতির নিয়মে ধরা পড়ে না এমন একটা কিছু শক্তি তার ভিতর আছে। সে কেবল কলের পুতুল হোতে পারে না, কোনো নৈসর্গিক শক্তি নিয়ে সে জন্মেছে। এই রকম কোনো প্রাণশক্তি—যাকে বার্গশোঁ (Bergson) "elan vital" বলেছেন—বিশ্বাস না করলে জীবের জটিল জীবনপ্রণালী আমাদের কাছে অবোধ্য। দৈহিক

ক্রিয়া যন্ত্রবৎ চালিত হয় মানছি, তার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকলাপ রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিক মাপকাঠিতে যাচাই করাও হয়তো সম্ভব; কিন্তু আমাদের মনের গতিবিধি কি কোনো রাসায়নিক নিয়মে ধরা পড়ে; আমাদের চিন্তা বা ইচ্ছাশক্তিকে কি কোনো ল্যাবরেটরির নিক্তিতে ওজন করা যায়।

প্রাণৈকান্তবাদী বলেন, জড়জগতের যা-কিছু নিয়ম এ পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি তার দ্বারা জীবনের গূঢ় রহস্য তলিয়ে বোঝা কখনই সম্ভব নয়। জড়বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞান কখনই এক হোতে পারে না। প্রাণীরা যে-ভাবে বাড়ে ও সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের যে-রকম সর্বদা পরিবর্তন ও ক্রমবিবর্তন হয়, তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যেমন ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ পায়, তাদের যেমন বুদ্ধি, জ্ঞান বা স্মরণশক্তি দেখা যায়—এর কোনো বিষয়টিই জড়বিজ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে আসে না।

জীবনরহস্য বোঝবার আর-একটি গুরুতর বাধা আছে। সেই কথাটি ব'লে এ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করব। আমরা নিজেরা জীবশ্রেণীয়, আমাদের মননশক্তি জীবজগৎ অতিক্রম ক'রে যেতে পারে না। আমাদের বুদ্ধি বা বিচারশক্তি সেখানে সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই আমরা মাপতে পারি। জীবন বা প্রাণ কী, এই প্রশ্নের শেষ উত্তর সেইজন্য বিজ্ঞান কখনো দিতে পারবে ব'লে মনে হয় না। এক্ষেত্রে যে আসামী, সেই-ই বিচারক। সুবিচার হবার সম্ভাবনা দুরূহ।